চতুর্থ অধ্যায়

হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্ব : নিম্নবর্গের শোষণ ও বঞ্চনার বিবিধ রূপ

৪. সূচনা

৪.১ নিম্নবর্গীয় সমাজে শোষণ-বঞ্চনার বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি

৪.১.১ সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনা

৪.১.২ অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা

৪.১.৩ রাজনৈতিক ও সম্প্রদায়গত শোষণ-বঞ্চনা

৪.১.৪ নারী শোষণ ও বঞ্চনা

৪.২ সারাংশ

৪. সূচনা

সমাজে যখন বা যেখানেই শোষক ও শোষিত—দুটি শ্রেণির উত্থান হতে দেখা গিয়েছে সেখানেই শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায়-অত্যাচার, নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে বারংবার। শ্রেণিবিভক্ত সমাজ সৃষ্টির পূর্বে মানুষ ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ। তখন রাষ্ট্র বলে কিছু ছিল না। কিন্তু কালক্রমে সমাজ এমন কয়েকটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হল যাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে অন্যের শ্রমের ফল কুক্ষিগত করার ক্ষমতা অর্জন করল এবং সেই মানুষদের প্রতি বলপ্রয়োগ করে তাদের সমস্ত কিছু কেড়ে নেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হল। ইতিহাসে দেখা যায়, এই শোষণ প্রক্রিয়া প্রথম শুরু হয়েছিল সমাজের দাসপ্রথার মধ্য দিয়ে, যার পরবর্তী স্তর হল—সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্রে মালিক-শ্রমিকরা পরিণত হল যথাক্রমে জমিদার ও ভূমিদাসে। জমিদাররা ভূমিদাস বা কৃষককে নিজেদের অস্থাবর সম্পত্তি বলে মনে করত। জমিদার হল ভূমি ও কৃষকের শ্রমের মালিক এবং তারা তাদের দিয়ে শ্রম করাতে বাধ্য করতে পারে। আসলে সামন্ততন্ত্র বহুবিস্তীর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মূল দ্বন্দ্ব ছিল সামন্ত প্রভু ও উৎপাদিত উদ্বৃত্তের সঙ্গে। সামন্ত প্রভু দ্বারা উদ্বৃত্ত উৎপাদন ভূমিদাসদের থেকে কেড়ে নেওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল এক ধরনের শোষণমূলক সামাজিক সম্পর্ক। কারণ প্রত্যক্ষ উৎপাদকের কাছ থেকে মজুরি বঞ্চিত উদ্বৃত্ত শ্রম যে বিশেষ অর্থনৈতিক রূপের মাধ্যমে নিষ্কাশিত করা হয়, সেটাই শোষক ও শোষিতের সম্পর্ককে নির্ধারিত করে। এই দ্বন্দ্ব যখনই শত্রুতায় পরিণত হয়েছে, তখনই তা কৃষক বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। পরবর্তীকালে উৎপাদকদের এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি ভেঙে পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়েছে। কীভাবে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ হয়েছে, এর কারণ হিসেবে বলা যায়—উৎপাদকেরা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্তির আশায় বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আংশিক সফল হলে তারা উদ্বৃত্ত ফসলের কিছু অংশ নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে। পরবর্তীকালে ভূমিদাসরা সেই উদ্বৃত্তকে বিক্রি করে পুঁজির মাধ্যমে কৃষির উন্নতি ঘটায় এবং নতুন নতুন জমিতে চাষ করা শুরু করে। এর মধ্য দিয়ে জমিদারদের সঙ্গে ভূমিদাসদের বৈরিতা আরো প্রকট হয় এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছল ও উন্নতকামী কৃষকদের সঙ্গে শোষিত কৃষকদের একটি শ্রেণি বিভাজন সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে মজুরি শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদনের রাস্তা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সম্পর্কের ভ্রূণ সঞ্চার হয়। এভাবেই বাণিজ্য-মুদ্রা প্রচলন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পুঁজিবাদী উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। (হিলটন ২০১২, পৃ ১৩৯-১৪১) পণ্যদ্রব্য ও মুদ্রার বিনিময়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হল পুঁজিপতি শ্রেণির। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই পৃথিবীব্যাপী

পুঁজিবাদী বিপ্লবের সূচনার মধ্য দিয়ে সামাজিক শ্রেণি বিভাজনের রূপ মৌলিকভাবে বদলে গিয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায়, সব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই পুঁজির মালিক, জমির মালিক, কল-কারখানার মালিকরা রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার একটি নগণ্য অংশ। বাকি জনগণের শ্রমের ওপর তাদের অবাধ বিধি আরোপিত নিয়ন্ত্রণ। ফলে সেদিক থেকে সমস্ত শ্রমজীবীদের ওপর তারা প্রভুত্ব করে এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের ওপর উৎপীড়ন ও শোষণ করে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রবক্তারাও ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার পুঁজিপতি শ্রেণির একটি নগণ্য অংশকে উচ্চবর্গ বা এলিট এবং বাকি জনসাধারণকে নিম্নবর্গ বা সাবঅলটার্ন বলে চিহ্নিত করেছেন। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম খণ্ডে এলিট সম্পর্কে রণজিৎ গুহের সিদ্ধান্ত,

> "The term 'elite' has been used in this statement to signify dominant groups, foreign as well as indigenous. The dominant foreign groups included all the non- Indian, that is, mainly British officials of the colonial state and foreign industrialists, marchants, financiers, planters, landlords and missionaries." (Guha (ed.) 1982, p. 8)

অন্যদিকে সাবঅলটার্ন বলতে তিনি বুঝিয়েছেন,

> "The terms 'people' and Subaltern classes' have been used as synonymous through-out this note. The social groups and elements included in this category represent the demographic difference between the total India population and all those whom we have deccribed as the elite. Some of these classes and groups such as the lesser rural gnntri, improverished landlords, rich peasants and uper middle peasants also 'naturally' ranked among the 'people' and the 'subaltern' could under certain Circumstanees act for the elite…" (Guha (ed.) 1982, p. 8)

ঔপনিবেশিক ভারতে উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী উচ্চবর্গ হিসেবে যারা চিহ্নিত হয়েছে তাদের বাদ দিলে যে বিপুল জনসংখ্যা অবশিষ্ট থাকে তারাই হল রণজিৎ গুহের সংজ্ঞায় 'People' ও 'Subaltern class'। লক্ষণীয়, সামন্ততন্ত্রে সামাজিক শোষণ সম্পর্কের সঙ্গে পুঁজিবাদী শোষণের তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আসলে সামন্ততন্ত্রে ভূমিদাস বা কৃষকরা সরাসরি তাদের শ্রমকে বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেও উদ্বৃত্তের অংশ থেকে বঞ্চিত হত, কিন্তু পুঁজিবাদের ফলে কৃষকদের এক অংশ বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত ফসলকে পুঁজিতে পরিণত করে সম্পন্ন কৃষক হয়ে দাঁড়াল এবং এক অংশ সর্বহারা হয়ে পড়ল। সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান,

> 'সামন্তশ্রেণীর আধিপত্য ও কৃষকের অধীনতাকে কেন্দ্র করে যে উৎপাদনব্যবস্থা, তার ভঙ্গুর অবস্থা; পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদনের সূত্রপাত; কৃষকদের মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া; জমি ও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বিচ্ছিন্ন এক সর্বহারা শ্রেণির সৃষ্টি; একই সঙ্গে শহরাঞ্চলে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় শিল্পোৎপাদনের প্রসার—মোটামুটি এইভাবেই সামাজিক উৎপাদনের সামগ্রিক ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের উদ্ভবকে দেখা হয়ে এসেছে। এরই সমান্তরাল প্রক্রিয়া হিসেবে যুক্ত

হয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণির সামাজিক কর্তৃত্ব বিস্তার—ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও যুক্তিবাদী সমাজদর্শন, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক আদর্শ, প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৫)

অর্থাৎ পুঁজিবাদের উদ্ভবের পরে সামাজিক শ্রেণিশোষণের রূপ বদল হলেও তা বজায় রয়েছে। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ নামে এক নতুন সামাজিক সম্পর্কের উদ্ভব ঘটেছে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে (বিস্তারিত আলোচনা, পৃ. ১৭-১৮) আমরা জেনেছি, আন্তনিও গ্রামশি 'সাবঅলটার্ন'-শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। প্রথমত, সিভিল সোসাইটি অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় সাবঅলটার্ন হল শ্রমিক শ্রেণি এবং দ্বিতীয়ত, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত অধস্তন কর্মচারী বা সাব-অর্ডিনেট অর্থে। লক্ষণীয়, প্রথম অর্থটি সরাসরি শ্রমিকশ্রেণি হিসেবে প্রয়োগ করা হলেও দ্বিতীয় অর্থে সরাসরি শ্রমিক হিসেবে 'সাবঅলটার্ন' শব্দটি প্রতিপন্ন হচ্ছে না। যদিও দুটি অর্থই ক্ষমতার নিরিখে কর্তৃত্ব ও অধীনতার মানদণ্ড গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে গ্রামশি দেখিয়েছেন, পুঁজিবাদী শ্রেণি কেবল শাসনের মাধ্যমে প্রভুত্ব বা কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সামাজিক সর্বজনসম্মত কর্তৃত্ব, যাকে তিনি 'হেজেমনি' বলেছেন। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে সাবঅলটার্ন স্টাডিজের প্রবক্তারা ভারতীয় সমাজে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ-এই বৈপরীত্যমূলক বাইনারি অবস্থানের কথা বলেছেন। যদি এই অর্থে উচ্চবর্গ এবং নিম্নবর্গ ধারণাটিকে গ্রহণ করা যায়, তবে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সাহিত্যের রূপবদলের সাপেক্ষে নিম্নবর্গের অবস্থান ও চেতনাকে আমাদের বুঝে নিতে হবে।

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে সমাজের তথাকথিত যে নিম্নশ্রেণি অর্থাৎ জেলে, মেথর, মুচি, পতিতা, নাপিত ইত্যাদি নিম্নবর্গকে উঠে আসতে দেখি, তারা উপরিউক্ত আলোচনার সাপেক্ষে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল ও পেশাগত দিক থেকে তথাকথিতভাবে নিম্নবৃত্তির। তাদের জীবন অসহায়, দুর্বিষহ, অভাবগ্রস্ত ও অস্বচ্ছল। তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল, দিন-রাত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজের ও পরিবারের জন্য খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজে যে শুধু সর্বহারাদের কথাই ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, আসলে সমগ্র সমাজের একটি ক্ষেত্র বিশেষে যে সমাজ-মানুষের বসবাস তাদের মধ্যে কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী। ক্ষমতার প্রেক্ষিতে তারা সেই নির্দিষ্ট সমাজের বিপরীত অবস্থানে বসবাস করে। ফলে একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েও তাদের আচরণে অর্থ ও ক্ষমতার দম্ভ এবং বৈপরীত্যমূলক অবস্থান সৃষ্টি হয়। যার দরুন তারা তাদের অপেক্ষাকৃত নিম্নবিত্তের মানুষের ওপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক অলিখিত অধিকার পেয়ে যায়। কিন্তু এরাই

আবার সেই নির্দিষ্ট সমাজের বাইরে অন্য কোনো প্রভুশক্তির অধীন। এইভাবে সমাজের সর্বত্র ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতার শৃঙ্খল বিরাজমান। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে রণজিৎ গুহ সমাজের এই ক্ষমতা বদলে অধীনতার বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন,

> '...সামগ্রিক ও শুদ্ধ অর্থে উচ্চবর্গের এই অংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অসমতা, এবং সেই অসমতার কারণ দ্বিবিধ: এক—সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের আঞ্চলিক বৈষম্য; আর দুই—এই অংশটির সামাজিক গড়নের সাংকর্য, অর্থাৎ তার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য। এই দ্বিবিধ অসমতার ফলেই যে-শ্রেণি বা সমূহ এক অঞ্চলে প্রভুস্থানীয় বলে গণ্য তারাই আবার অন্যত্র আর এক প্রভুগোষ্ঠীর অধীন।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৩৩)

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের বৈষম্যের ফলে একপক্ষ অন্যপক্ষের কাছে শোষিত ও শাসিত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা কথাবিশ্বে বর্ণিত সমাজের তথাকথিত সেই নিম্নবর্গীয় সমাজে সংঘটিত শোষণ-বঞ্চনা-অন্যায়-নিপীড়নের প্রকৃতি ও রূপরেখা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করব।

৪.১ নিম্নবর্গীয় সমাজে শোষণ-বঞ্চনার বিভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি

হরিশংকরের কথাসাহিত্যে আলোচ্য এই দ্বিবিধ অসমতার মধ্যে সামাজিক বৈষম্য ততটা প্রকট না হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্য রয়েছে। ফলে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল ও ক্ষমতাবান নিম্নবর্গ একই সমাজে বসবাস করেও সর্বহারাদের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। দেখা গিয়েছে সাধারণের ওপর তাদের অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনার নানারূপ। তবে এই শোষণ-বঞ্চনা কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্র বিশেষেও দেখা যায়। গল্প-উপন্যাসগুলি গভীর অধ্যয়নে আমরা দেখেছি নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষেরা শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে নিম্নলিখিত দিক থেকে। যেমন-

ক) সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা

খ) অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা

গ) রাজনৈতিক ও সম্প্রদায়গত শোষণ-বঞ্চনা

ঘ) নারী শোষণ ও বঞ্চনা

হরিশংকরের কথাসাহিত্যের ভিত্তিতে উপরিউক্ত শোষণ-বঞ্চনার রূপ ও প্রকৃতিগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা হল।

৪.১.১ সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা

সমাজ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হওয়ার কারণে সেখানে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রবণতা দেখা যায়, যাকে আপাত অর্থে সামাজিক শৃঙ্খলা বলে। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান সন্ধানে সমাজ দ্বারা সৃষ্ট নানা বিধি-নিয়মের মধ্য দিয়ে সমাজকে বিশৃঙ্খল মুক্ত করার প্রয়াস থাকে। কিন্তু সেই বিধি নিয়মে যখন পক্ষপাতিত্বের সঞ্চার হয় তখন সামাজিক মানুষের মধ্যে জাতিভেদ, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় বঞ্চনা, শিক্ষা বিস্তারে অসমতার মতো বিভিন্ন সমস্যা সমাজের একপক্ষের ক্ষেত্রে লাভ ও সুবিধাজনক এবং অন্যপক্ষের ক্ষেত্রে ক্ষতি ও অসুবিধাজনক ফল বয়ে আনে। সেক্ষেত্রে সমাজের মানুষ হিসেবে সমান অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। একই সমাজে বসবাসকারী মানুষেরা কেউ জাতপাতজনিত কারণে, কেউ আয়ের ভিত্তিতে আবার কেউ পেশাগত কারণে উচ্চ-মধ্য-নিম্ন এই মানদণ্ডে শ্রেণিবিভাজিত হয়ে পড়ে। ইতিপূর্বেই আমরা জেনেছি, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসক ও শোষিত শ্রেণির উদ্ভব হয়। শ্রেণি বিভাজনে এক শ্রেণি সুবল এবং অপর শ্রেণি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক চলতেই থাকে। সাহিত্যের আকল্পে হরিশংকরের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সমাজে এ ধরনের সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনার রূপ দেখা গিয়েছে, যা নিম্নে আলোচিত করা হল।

৪.১.১.১ জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতাজনিত শোষণ-বঞ্চনা

'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখা যায় বর্ণ-হিন্দুরা জেলেদের ঘৃণা মিশ্রিত চোখে দেখেছে, কারণ সমাজে তারা নিম্নবৃত্তির মানুষ। দেখা যায়, গঙ্গাপদ স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর বর্ণ-হিন্দু পরিবারের সন্তানরা তার থেকে দূরে দূরে থাকে। একসঙ্গে বেঞ্চে বসলেও মাঝখানে খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখে-

> 'দুষ্ট ছেলেরা জাইল্যা, ডোম বলে ঘৃণামিশ্রিত ইয়ার্কি করে তার সঙ্গে। তাদের নিষ্ঠুর আচরণ গঙ্গাকে বিপন্ন করে।'
>
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৩২)

শ্রেণিবিভাজিত সমাজ হিন্দুদের মান্যতা দিলেও জেলেসম্প্রদায় করুনার পাত্র। ঘৃণা, তিরস্কার, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার অভিঘাতে গঙ্গার মতো এক শিশুর মনে বিদ্যালয়, পড়াশুনা, সহপাঠী এসবই অসহনীয় হয়ে উঠেছে। 'দহনকাল' উপন্যাসেও হরিদাসের হাইস্কুলের প্রথম দিনে স্কুলের অন্যান্য ছাত্ররা তাকে 'জাইল্যা', 'ডোম' বলে ঘৃণা প্রদর্শন করেছে। শুধু তাই নয়, একই সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও জেলেরা দ্বিধাবিভক্ত। পেশাগত কারণে জেলেদের মধ্যে দুটি ধারা রয়েছে—যাদের মধ্যে একটি ধারা মাছমারার পাশাপাশি নিজেদের জমি জমায় চাষ আবাদ করার সুযোগ পেয়েছে এবং অন্যধারাটি কেবল মাছমারার ওপরই

নির্ভরশীল। ফলে হালিক কৈবর্তরা জালিক কৈবর্তদের নিম্নজাতের বলে ঘৃণা প্রদর্শন করেছে। এর উদাহরণ হিসেবে আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায়- কৈবর্তপাড়ায় শিবশরণের বাড়িতে নিমন্ত্রিত কৈবর্তদের সঙ্গে হরবাঁশির মতো জালিক কৈবর্ত একই সারিতে খেতে বসলে শশধর তার সঙ্গে খেতে নারাজ। প্রদীপও তার সঙ্গে বলে ওঠে-

'...তোঁয়ারার লগে এক লাইনত্ বই আঁরা ভাত খাইয়ম কেএনে? তোঁয়ারা ছোডজাত।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৫৬)

নিজসম্প্রদায়ে নিচুজাতের কাছেও জেলেরা ছোটোজাত হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে কাঁইচোবালা গ্রীষ্মের কোনো এক দুপুরে নাপিত পাড়ায় মাছ বেঁচতে গিয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। শীল বাড়ির বড়ো বউয়ের কাছে জল চাইলে সে তাকে হাতের আজলা ভরে জল খাওয়ার নির্দেশ দেয়। কাঁইচোবালার বুঝতে আসুবিধ হয় না যে, জেলেদের নাপিতরাও ঘৃণার চোখেই দেখে। তাই তো রাধাগোবিন্দের মনে প্রশ্ন জাগে-

'বাওনর কাছে ছোড জাত, কাস্থর কাছে ছোড জাত, নাইতর কাছেও ছোড জাত। এ-ন কি আঁরার জাতভাই কইত্তরঅলেও কইলো আঁরা ছোড জাত। তই, আঁরা কি আসলে ছোড জাত না জেডা?' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৬৬)

রাধাগোবিন্দের প্রশ্নের উত্তর বৃদ্ধ ঠাকুরদাসের অজানা। তথাকথিত নিম্নবর্গ হয়েও সামগ্রিক সমাজের অন্যান্য স্তরেও অচ্ছুৎ ও অন্ত্যজ হিসেবে সমানাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে জেলেরা। সামাজিক শ্রেণিভেদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে কর্ম ও গুণের ভিত্তিতে মানুষের মূল্য ও মর্যাদা শূন্য। জন্মই আসল পরিচয়। ফলে জাতিগতভাবে আবহমানকাল ধরে জেলেরা সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও শোষিত হয়ে এসেছে।

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে জাতিভেদের ঘৃণ্যরূপ আমরা লক্ষ করি। শিকলভাঙা গ্রামে নাপিতরা জেলেদের চুল কাটে না। শুধু জেলে নয়, মুচি-ধোপা এদেরও চুল কাটতে তাদের আপত্তি। কারণ নাপিতরা জেলে-মুচি-ধোপাদের থেকে নিজেদের উঁচুজাতের বলে মনে করে। তাদের মতে, উঁচুজাতি নিচুজাতির মানুষদের কোনোরূপ সেবা করে না। বহুকাল আগে থেকেই শিকলভাঙা গ্রামে এই প্রথা চলে আসছে। এই অঞ্চলের তথাকথিত নিম্নজাতের মানুষেরা গঞ্জের কোনো নাপিতের কাছে ক্ষৌরকার্য করাতে পারে না—তাদের যেতে হয় দূর গ্রামে বা নদীর ওপারে। উপন্যাসে উত্তরপতেঙ্গার ছেলে সীতানাথের শিকলভাঙা গ্রামের এই জাতিবিদ্বেষের কথা জানা নেই বলে সে তার ভাগ্না-ভাগ্নিকে নিয়ে গঞ্জের বঙ্কিম শীলের দোকানে যায়। সেখানে সীতানাথের আসল পরিচয় প্রকাশ্যে এলে বঙ্কিম চেঁচিয়ে ওঠে,

'তুই আমারে দিয়া জাইল্যার চুল কাটাইলি! মহাপাতক কইরলি তুই আমারে! (জলদাস ২০১৯, পৃ.২১১)

জাতিভেদের নামে এ ধরনের অমানবিক ঘটনা সামাজিক অন্যায় ও নিপীড়নে পর্যবসিত হয়েছে।

'অর্ক' উপন্যাসেও জেলেদের ওপর হিন্দু-মুসলমানের জাতবিদ্বেষ দেখা যায়। যুগ যুগ ধরে জেলেরা যে সমাজের অপমান লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করে এসেছে তার জন্য দায়ী তাদের প্রতিবাদহীনতা। উপন্যাসে দিবাকরকে স্কুলে ভর্তি করাতে গিয়ে বলরামদের মতো জেলেদের জাতপাতের নামে কঠিন সংগ্রামের মুখে পড়তে দেখা যায় বারবার। উপন্যাসে জানা যায়,

> 'বংশানুক্রমে এতটি বছর তারা মুখ বুজে হিন্দু-মুসলমানের অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করে এসেছে। কথায় কথায় জাইল্যা-ডোম বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। ঘরে আসন পেতে বসতে বলেনি কোনোদিন। নৌকা থেকে পাঙাশ মাছটি, ইলিশ মাছটি, কোরাল মাছটি হাতে ধরে নিয়ে গেছে, দাম চাইবার সাহস করেনি। কখনো বা দাম চাইলে ছাতার বাঁট দিয়ে মাথায়-গায়ে বাড়ি মেরেছে। এসব অত্যাচারের কোনোই তো প্রতিবাদ করেনি তারা। প্রতিবাদ করার কথা মনেই আসেনি কোনোদিন।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ২৩)

তবে শুধু জেলেরাই নয়, জাতপাতের শিকার হয়েছে সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণি মুচি- মেথররাও। 'রামগোলাম' উপন্যাসে জাতপাতের নামে যে সামাজিক অন্যায় ও বঞ্চনা দেখা যায়, সেখানে মেথরদের মানুষ বলে ভাবা হয় না। কারণ তারা নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করে। সামাজিক বঞ্চনার চাপে মেথররা দিশেহারা। 'রামগোলাম' উপন্যাসে দেখি, বাল্লু জমাদারের ছেলেটি কোর্টহিলের চা-এর দোকানের সামনে গাড়ি চাপা পড়ে থাকলেও মেথর সন্তান বলে কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। এর থেকে অমানবিক দৃশ্য উপন্যাসে দ্বিতীয় নেই। জেলে সম্প্রদায়ের মতোই মেথররাও সামাজিকভাবে নিম্নবর্গের মধ্যে অস্পৃশ্য ও ছোটোজাত। তাই তো রামগোলাম যখন রিক্সা করে শহরে বাবাঠাকুরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় তখন তার মেথর পরিচয় জেনে রিক্সাওয়ালার চোখে ঘৃণা ভেসে ওঠে। রামগোলাম যাওয়ার পর একটি কাপড়ের টুকরো দিয়ে সে রামগোলামের বসার জায়গাটি মুছতে থাকে। আবার ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টিতে মেথরদের জন্য তৈরি স্কুলে মেথররাই বঞ্চিত হয়েছে। স্কুলের হেডমাস্টার মেথরদের একেবারে শেষের বেঞ্চে বসার আদেশ দেন। প্রতিনিয়ত মেথররা অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের অভিশাপ বহন করে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, মেথরপট্টির সর্দার গুরুচরণের শবদেহ দাহ করার জন্য রামগোলাম, চেদিলাল, কার্তিকরা শ্মশানে পৌঁছলে ডোম রামদাস তাদের মরা পোড়াতে দেয় না। উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী,

> 'রামদাস এই শ্মশানের ডোম। মরা পোড়ানোর দায়দায়িত্ব তাকে দিয়েছে শ্মশান-কমিটি। শহরের উঁচু বর্ণের গণ্যমান্য হিন্দুরা এই কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি, সদস্য। ... ওরাই তাকে বলে দিয়েছে—মেথর, জেলে, হাঁড়ি—এসব নীচু জাতের মৃতদেহ পোড়াবে ওই ওদিকে, খালের পাড়ে। আর এই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাঁধানো চুলাটি উঁচু বর্ণের জন্য।... খবরদার, এর ব্যতিক্রম করলে চাকরি খাব তোমার।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১০৯-১০)

'কোটনা' গল্পেও দেখা যায় রামদুলাল মুচি অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের কারণে হাটে-বাজারে বিনা প্রতিবাদে কিল-চড়-লাথি সহ্য করে। আবার শিক্ষাক্ষেত্রেও মুচির সন্তান বলে গল্পকথক অশোককে ক্লাসের শেষ বেঞ্চে বসার আদেশ দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক ভবতোষ চক্রবর্তী।

নিম্নবর্গীয় সমাজে এই জাতিভেদ জনিত সামাজিক ব্যাধি সমাজের তথাকথিত নিচুতলার অন্ত্যজ মানুষকে কোণঠাসা করেছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর সাম্প্রতিক আলোচনাতেও জাতিভেদ প্রথার প্রসঙ্গটি উল্লেখযোগ্যভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। দেখা গেল, জাতিভেদ প্রথার ধর্মীয় ভিত্তি সাম্প্রতিককালে নেই। এখন জাতিভেদ বলতে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর অবস্থানকে নির্দেশ করে। তথাকথিত সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার সাপেক্ষে জাতপাতজনিত পরিচয় গণ্য করা বা না-করার সাধ্যের মধ্যে সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্গের আধিপত্য বিস্তারের কৌশল রয়েছে। অর্থাৎ উঁচুজাতের ব্যক্তি (যেমন ব্রাহ্মণ/ক্ষত্রিয়) নিচুজাতের (শূদ্র) ব্যক্তির প্রতি সহজেই ক্ষমতা বিস্তার করার অধিকার পায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে জাতিভেদজনিত সামাজিক শোষণের কারণ হিসেবে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-র সমালোচকদের মধ্যে নানা তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। মার্কসবাদী সমালোচকদের মধ্যে জাতিভেদ নিয়ে দু-ধরনের মতবাদ রয়েছে,

> "Most have argued that caste in a feature of the superstructure of Indian society and ought to be understood in terms of its efficacy as an ideological system which reflects the basic structure of material (i.e. productive) relations the letter of course being characterized in terms of class relations. Others have suggested that cost is in fact the specially Indian form of material relations at the base, within its own historical dynamic; caste, in other words, is the form in which classes apear in Indian society." (Guha (ed.) 1999, p.175)

অর্থাৎ ভারতীয় শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বর্ণ হল উপরিকাঠামোর একটি বৈশিষ্ট্য এবং এটিকে একটি আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে এর কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা উচিত যা উৎপাদন সম্পর্কে মৌলিক কাঠামোকে প্রতিফলিত করে। বর্ণ হল প্রকৃতপক্ষে তার নিজস্ব ঐতিহাসিক গতিশীলতার সঙ্গে মৌলিকভাবে বস্তুগত সম্পর্কের বিশেষ ভারতীয় রূপ। বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় সমাজে পেশা ও জন্মগত শ্রেণিবিভাজনের বহু প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক রূপ। যার দরুন উঁচুশ্রেণি বা জাতির মানুষেরা তাদের থেকে অপেক্ষাকৃত নিচুজাত, শ্রেণি বা পেশার মানুষের ওপর নানাভাবে সামাজিক শোষণ করে। ইতিপূর্বে গল্প-উপন্যাসের আলোচনায় আমরা লক্ষ করেছি, তথাকথিত নিচুজাত, শ্রেণি ও পেশার মানুষেরা একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিচুজাতি ও অস্পৃশ্য বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এই সামাজিক অপমান আসলে

সামাজিক শোষণেরই অন্যরূপ। হরিশংকর তাঁর আত্মজীবনী 'নোনাজলে ডুবসাঁতার'-এ এই সামাজিক অবমাননা সম্পর্কে তাই বলেন,

'এই একবিংশ শতাব্দীতেও শুধু জেলে হবার অপরাধে কী পরিমাণ নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয় আমাদের, তা আমার মতো ভুক্তভোগী ছাড়া, অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা বুঝবেন না।' (জলদাস ২০১৮, পৃ.৩৮)

৪.১.১.২ বিবাহ-পণজনিত শোষণ

শুধু জাতিভেদজনিত শোষণ-বঞ্চনাই নয়, নানাবিধ সামাজিক অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়নের চিত্রটিও হরিশংকরের গল্প-উপন্যাসে উঠে এসেছে। সামাজিক শোষণের একটি চিত্র হল বিবাহ-পণপ্রথা। হরিশংকরের আখ্যানে পণপ্রথার চিত্রটি দু'রকম। যেমন 'জলপুত্র' উপন্যাসে বিবাহের সময় কন্যাপণ নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহ করার সময় বরপক্ষকে কন্যার পিতার দাবি অনুযায়ী নগদ অর্থ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী দিতে হয়েছে। ভুবনেশ্বরী ও চন্দ্রমণির বিয়ের সময় ভুবনের পিতা নৈদরবাঁশিকে কন্যাপণ নিতে দেখা গিয়েছে।

'ছয় কুড়ি টাকা কন্যাপণের বিনিময়ে মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হল নৈদরবাঁশি।' (জলদাস, ২০০৮, পৃ.১৪)

আবার বংশীকে বিয়ে করানোর সময় পিতা ভোলানাথকে কন্যার পিতা রাধামোহনকে কন্যাপণ দিতে হয়েছে। রাধামোহন পাঁচ কুড়ি টাকা দাবি করলেও ভোলানাথ তাকে চার কুড়ি টাকায় রাজি করিয়েছে। কিন্তু 'দহনকাল' উপন্যাসে বিবাহপণের চিত্রটি উল্টো। কাল পরিবর্তনে সামাজিক নিয়মের পরিবর্তন হয়েছে এক্ষেত্রে। এখানে দেখা গেল কন্যাপণের অবলুপ্তি এবং বরপক্ষের যৌতুক দাবি করার ঘটনা। উপন্যাসে বসুমতীর বাবা হরবাঁশি টাকার অভাবে ছোটো মেয়েটির বিয়ে দিতে পারছে না। বরপক্ষের লোভের মাত্রা দেখে হরবাঁশি পিছিয়ে গিয়েছে বারবার। আমরা জানি একই সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন থাকলেও পরস্পরের সমাজ-সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ফলে সামাজিক প্রথার পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে জেলে সমাজে বরপক্ষের যৌতুক দাবির প্রথা ছিল না।

'কুলীনসমাজ থেকে এই প্রথা জেলেসমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। জেলেসম্প্রদায়ের বরপক্ষ কুলীনসমাজ থেকে আর কিছু না শিখলেও এই কুপ্রথাটি ভালো করে রপ্ত করে নিয়েছে।' (জলদাস ২০১০, পৃ.২৫)

বিবাহপণ—সে কন্যাপণ হোক বা বরপক্ষের যৌতুক দাবিই হোক, পণপ্রথা আসলে সামাজিক অবস্থান ও আধিপত্যের নামে আর্থ-সামাজিক শোষণ মাত্র। গবেষক আর. এম কাম্বলে পণ সম্পর্কে বলেছেন-

'Basically the dowry was not based on greed and extortion as it is identifies in the present scenario; in reality, it was suposed to be a token of love affection and sonic kind of regared of the bridegrooms. In the ancient documents such as thindu shastras the term 'Varadakshina',was nothing

but some kind of 'Dakshina', payment of a purely voluntary nature; further, It was considered as on the of the important rituals to fulfill the act of 'Kanyadanum'- giving away the bride in marriage. Hare it is to be remembered, that the brides' present, through the dowry were ensuring her security enabliny her to lead a dignified and harmonious relationship with the groom's family.'

(Kamble,2021 P-142-43)

পণপ্রথার কারণে শ্বশুরবাড়িতে একজন বধূকে যে পরিমাণ নির্যাতন সহ্য করতে হয় যা কিছু ক্ষেত্রে আত্মহত্যা বা হত্যা পর্যন্ত পৌঁছে যায়—এরকম কোনো ঘটনার উল্লেখ হরিশংকরের আখ্যানে পাওয়া যায় না। কিন্তু বরপক্ষের দাবি মেটাতে গিয়ে 'দহনকাল' উপন্যাসের আদাব স্যারকে সর্বস্বান্ত হতে দেখা গিয়েছে,

'গত চার বছরে চারটা মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ফতুর হয়ে গেলেন আদাব স্যার। ... মেজজামাইকে বেহালায় একটি ওষুধের দোকান সাজিয়ে দিতে হলো।... তৃতীয় মেয়ে সে-সময়ের মেট্রিক পাস। তাই বিদ্বান ছেলের কাছেই বিয়ে দিতে হলো সুজাতাকে। ... এই জামাইয়ের খাই মেটাতে সর্বস্বান্তই হতে হলো আদাবস্যারকে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৩৮)

শেষ সম্বল জমিটুকু কম দামে আব্দুল খালেক মেম্বারের কাছে বিক্রি করে দিলেন আদাব স্যার। দুটো বড়ো পুকুরের একটি বড়ো মেয়ের বিয়ের সময় বিক্রি করেছিলেন। আরেকটি পুকুর সদানন্দ মহাজনের কাছে বন্ধক রেখেছিলেন চতুর্থ মেয়ের বিয়ের সময়। ফলে আদাব স্যার কন্যাদানের পরিবর্তে নিঃস্ব হয়েছেন। গবেষক কাম্বলের মতে, বরপক্ষের পণের দাবী মেটানোর মধ্যে দিয়ে কন্যার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা রক্ষা, শ্বশুরবাড়ির সামনে কন্যার মধ্যে দিয়ে নিজের মানমর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা এবং বরপক্ষের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির উদ্দেশ্যে অভিভাবকরা পণ নামক শোষণ সহ্য করে। পণপ্রথার বিরোধিতা করে 'The Dowry prohibition Act' নামে ১৯৬১ সালের ২০ মে পার্লামেন্টে আইন পাস হয়। কিন্তু তাতেও পণপ্রথা রোধ করা যায়নি। হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাসে জেলেসমাজ বর্ণনা প্রসঙ্গে পণপ্রথার কথা উঠে এসেছে সামান্যভাবে।

৪.১.১.৩ পারিবারিক শোষণ ও বঞ্চনা

জীবনযাপন করার জন্য মানুষ যে সব প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে তার মধ্যে বিয়ে ও পরিবার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন। সমাজ গঠনের পেছনে পরিবার ও পরিবারভুক্ত মানুষের অগ্রগণ্য ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে বিয়ে নামক আচার ব্যবস্থাটি এক পরিবারের সঙ্গে অপর পরিবারের মিলনের মাধ্যম। পারিবারিক মিলনে নতুন সম্পর্কের জন্ম হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তি-পরিবারের সঙ্গে প্রেম-ভালোবাসা, বৈরিতা, ঈর্ষা ও ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে একজন নারীকে তার নিজস্ব পরিবার ছেড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন

অপরিচিত এক পরিবারে এসে উঠতে হয় বিবাহের মাধ্যমে। সেই বিবাহিত নারীকে সবসময় সকল পরিবার সমান গুরুত্ব দিয়ে স্বাগত জানাবে এমনটা নয়। পরিবারে একসঙ্গে থাকতে হলে ইতিবাচক সম্পর্কের পাশাপাশি নেতিবাচক সম্পর্কেরও সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে কিছু ক্ষেত্রে শাশুড়ি-ননদের সঙ্গে পুত্রবধূর মান-অভিমান, দ্বন্দ্ব, বচসা, ঈর্ষার রেশ চলতেই থাকে যা কখনো কখনো শোষণ, নির্যাতনের পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে মূলত জেলে, মেথর, পতিতা, মুচি ইত্যাদি নিম্নবর্গীয় সমাজের পারিবারিক জীবনের কথা উঠে এসেছে। যেখানে প্রায় প্রতিটি পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ বংশবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি করা উক্ত সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া একান্নবর্তী পরিবার হয়ে বাস করার মধ্যেও উপার্জনের জন্য অধিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থাকে। এই কারণেই কথাসাহিত্যে বর্ণিত জেলে বা মেথর সম্প্রদায়কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের অন্তর্গত হতে দেখেছি। তাছাড়া তথাকথিত জেলে-মুচি-মেথর-পতিতা সমাজে স্ত্রীয়ের অর্থনৈতিক উপার্জনের পেছনে সাময়িক ভূমিকা থাকলেও অন্যান্য মূলত নানা প্রকার অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব কর্তব্য পালন করার ক্ষেত্রে পুরুষরাই এগিয়ে আসে। ফলে মেয়েদের আর্থিক নির্ভরতা অর্জন করার সম্ভাবনা থাকলেও পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষমতা এবং মর্যাদা অনেক সীমিত এবং সংকুচিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সমতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না। তাছাড়া পারিবারিক সম্পর্কগুলোও সবসময় স্থির থাকে না। সম্পর্কের উন্নতি-অবনতির মধ্য দিয়ে একটি পরিবার ও পারিবারিক প্রকৃতির স্বরূপ ফুটে ওঠে।

প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয়, সমাজে শ্রেণিবিন্যাসের কারণে যেমন শোষক-শোষিত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে, তেমনি পরিবার ও পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে মর্যাদা ও ক্ষমতার বিন্যাসে এক ধরনের শাসক-শাসিতের বৈপরীত্য ধরা পড়ে। হরিশংকর জলদাসের গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যে পারিবারিক শোষণ, অন্যায়, অত্যাচার ও বঞ্চনার দিকগুলি যেভাবে উঠে এসেছে তা আমরা আলোচ্য পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যা করব। পরিবার বা পারিবারিক সম্পর্কের কথা থাকলেও পারিবারিক শোষণের চিত্রটা ততটা প্রকট নয়। আখ্যানের প্রয়োজনে ও সমাজ বাস্তবতা বজায় রাখার নিমিত্তেই আমরা পারিবারিক শোষণের ঘটনা বর্ণিত হতে দেখেছি। যেমন-

'জলপুত্র' উপন্যাসে বর্ণিত কেন্দ্রীয় পরিবারটি ভুবনেশ্বরী, গঙ্গাপদ ও হরিবন্ধুকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। ভুবনের স্বামী চন্দ্রমণি এক সময় সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। অসুস্থ শ্বশুর কর্মক্ষমতা

হারিয়ে শয্যাশায়ী হওয়ার দরুন পরিবারের কর্ত্রী ভুবনেশ্বরী। উপন্যাসে জানা যায়, হরিবন্ধুর এক দুঃসম্পর্কের ভাই গোলকবিহারী। ভাই হওয়ার সুযোগ নিয়ে সে তার ছেলে, ছেলে-বউ, স্ত্রী নিয়ে হরিবন্ধুর উঠানের পূর্বপাশের খোলা জায়গাটি দখল করার পরিকল্পনা করে। বিষয়টি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে তার ছেলেরাও সমর্থন জানায়।

> 'দিন দুয়েকের মধ্যে গোলক ও তার তিনপুত্র তিন-চারজন ঘরামির সহযোগিতায় ভুবনদের সেই খালি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় চার-কামরার একটা চৌচালা ঘর তুলে ফেলল। পাড়া প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাকে এড়িয়ে কতকটা রাতের আঁধারেই সেই ঘরে পরিবার-পরিজন নিয়ে উঠে এল।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৬০)

এখন প্রশ্ন হল, গোলকবিহারীর জায়গা দখল ও বাড়ি তৈরি করে সেখানে বাস করার সাহস বা বলা ভালো ক্ষমতা এল কীভাবে?

প্রথমত, আধিপত্যকামীর মনে স্বার্থের উৎপত্তি হওয়া। যেমন গোলকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সে তার স্ত্রী, ছেলে, ছেলে বউ, নাতি-নাতনি নিয়ে যে সংকীর্ণ স্থানে বসবাস করছিল সেখানে তার সংকুলান হচ্ছিল না। ফলে বড়ো কোনো জায়গা জুড়ে বাড়িঘর তৈরির প্রয়োজন দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, গোলকবিহারী হরিবন্ধুর দূর সম্পর্কের এক ভাই বলে নিজেকে দাবি করে। সেই সূত্রে হরিবন্ধুর জমি জায়গার অংশীদার হিসেবে নিজেকে মনে করে।

তৃতীয়ত, চন্দ্রমণির মৃত্যু, হরিবন্ধুর অসুস্থতা, গঙ্গাপদর নাবালকত্ব ও ভুবেনেশ্বীর অক্ষমতা সম্পর্কে গোলক ওয়াকিবহাল।

চতুর্থত, গোলকবিহারীর তিন পুত্র সবসময়ই একজন পিতার বাহুবল হিসেবে কাজ করেছে।

সুতরাং ক্ষমতার শৃঙ্খলায় গোলকবিহারীরা আধিপত্যকামী বা ডমিন্যান্ট শ্রেণি ও ভুবনেশ্বরীর পরিবার হল সাবঅর্ডিনেট বা অধীনস্ত। আধিপত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে গোলকবিহারী প্রথমে 'Persuasion' অর্থাৎ প্ররোচনা সাহায্য নিয়েছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে 'Coercion' অর্থাৎ জোরজবরদস্তি করার জন্যও প্রস্তুত থেকেছে। গোলকবিহারীর পরিবার কর্তৃক ভুবনেশ্বরীর পরিবারের জমি জায়গা দখল করা পারিবারিক শোষণেরই একটি উদাহরণ।

আবার ভুবনেশ্বরী স্বামী হারানোর বারো বছর পর বৈধব্য ধারণ করলে তার নতুন সধবা অবস্থার শাড়িগুলো নিয়ে যায় ননদ উর্বশী।

> 'তোঁয়ার সুট্‌কেশত্ দেইলাম দে বউত্ শাড়ি পড়ি রইয়ে। তোঁয়ার তো এখন বিধবার বেশ। ধুতি পরো। রঙিন কাওর পরইন্যা কেউ নাই। তোঁয়ার শাড়িগিন আঁরে দি ফেলাও না।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৮২)

ভুবন শাড়িগুলি রেখেছিল তার স্বামীর স্মৃতি হিসেবে। কিন্তু উর্বশীর এই আচরণে বাধ্য হয়ে পরদিন সে তাকে তিনটি শাড়ি বের করে দিলেও একটি নতুন শাড়ি প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়েছে উর্বশী। শুধু তাই নয়, কাউকে কিছু না জানিয়ে যাওয়ার সময় একটা বস্তার মধ্যে পাঁচটা নারকেল, দুটো ভাত রাঁধার সিলভারের বড়ো পাতিল ও দুটো হাঁস বেঁধে নিয়েছে সে।

'জলপুত্র' উপন্যাসে মধুরামের পরিবারে তার স্ত্রী মধুরাম দ্বারা বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত হয় বিনা অপরাধে। জানা যায়, মধুরামের পরিবারে অভাব দেখা দিলে সে হরগোবিন্দ বহদ্দারের বাড়িতে গাউর খাটতে যায়। মরসুম শেষে মধুরাম আর উত্তর পতেঙ্গায় ফিরে আসে না। উপন্যাসে দেখি-

> 'হরগোবিন্দ বহদ্দারের বিধবা মেয়েটিকে সাঙ্গা করে সেখানেই থেকে গেছে। টুনিবউ নাবালক বাচ্চা দুটোকে নিয়ে তার কাছে গেছে। নানা কাকুতিমিনতি করেও মধুরামকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। বাচ্চা দুটোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সে ভিক্ষে করতে শুরু করেছে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.৯৯)

বোঝাই যাচ্ছে, সংসারে অভাব অনটনের সম্মুখীন হয়ে মধুরাম আরো একটু আর্থিক স্বচ্ছলতার আশায় হরগোবিন্দের বাড়িতে গাউরের কাজ করতে গিয়েছিল। কিন্তু ঘরের চার দেওয়ালের বাইরের পরিবেশের প্রভাবে সে স্ত্রী-সন্তানের প্রতি দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়েছে। অন্য একজন স্ত্রীকে 'সাঙ্গা' বা বিয়ে করতে তার বাধেনি। টুনি বউয়ের শত অনুরোধেও ফিরে না আসা মধুরাম স্ত্রীর প্রতি বঞ্চনা ও অন্যায় করেছে।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে 'দুখিনি' গল্পে। গল্পে কিষ্টপদ ও রসবালার দাম্পত্য জীবন সুখের হলেও অভাব দারিদ্র্যে সংসারের আনন্দটুকু ধীরে ধীরে মুছে গিয়েছে। দিনমজুরি দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছে না বলে সে বাধ্য হয়ে কুমিরার নকুল বহদ্দারের বাড়িতে গাউর খাটতে যায়। সেখানে নকুল বহদ্দারের বিধবা মেয়ে কেতকিবালাকে সাঙ্গা করে। মধুরামের মতোই সে আর উত্তর পতেঙ্গায় ফিরে আসে না। রসবালা বড়োছেলে মনমোহনের হাত ধরে কিষ্টপদর কাছে গিয়ে শত অনুনয় করলেও সে ফিরে যেতে নারাজ। তার মতে,

> 'বউত জ্বালাইয়স চোদানির ঝি। এখন যা, তোর লাং অল লই দিন কাডা গই।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.৪১)

পারিবারিক সমস্যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল, শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি ও বৌমার দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষা। এই ঈর্ষা একসময় এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তা অত্যাচার বা শোষণের রূপ গ্রহণ করে। 'দহনকাল' উপন্যাসে জানা যায় কৃষ্ণমিলনের স্ত্রী মঙ্গলি বড়ো ভালো মেয়ে। সদ্য বিবাহিত মঙ্গলি শ্বশুরবাড়িতে সকলের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষ্ণমিলনের মা ঝগড়ুটে স্বভাবের। এর মধ্যে বোনেরা তার মাকে ইন্ধন জোগায়।

> 'দুই মাসে মা-মেয়েরা মিলে মঙ্গলির জীবনটাকে তছনছ করে ছেড়েছে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৯)

বউয়ের প্রতি শাশুড়ির অত্যাচার অন্যায়ের ঘটনা 'প্রতিশোধ' গল্পেও লক্ষণীয়। গল্পে দেখা যায়, মাধুরী বাপের বাড়িতে আসার সময় তার শাশুড়ি তাকে দশ দিনের মধ্যে ফিরে আসতে বলে। খারাপ পরিস্থিতির কারণে দশদিনের মধ্যে ফিরতে না পারায় মাধুরীর চরম অপমান করেন শাশুড়ি,

'বেয়াক্কেল বেয়াইকে বলছিলাম দশদিনের মাথায় বউয়েরে দিয়া যাবেন, পাত্তা দেন নাই আমারে। আজ সতেরো দিন। কান ধইরা নাকে খত দিতে দিতে ঢুক দুইজনে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৮৬)

বউয়ের বাপের বাড়িতে কিছুদিন বেশি থাকা সহ্য করতে পারেনি মাধুরীর শাশুড়ি। শুধু তাই নয়, ঘটনাচক্রে জানা যায় মাধুরীর স্বামী বিচিত্রবীর্য ছোটোবেলা থেকেই জুয়াখোর, চরিত্রহীন, চিটিংবাজ ও মাতাল। মাধুরীর বিয়ের সময় বরপক্ষ এইসব কথা চেপে রেখে অন্যের বাড়ির মেয়েকে সারাজীবন কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য করার মধ্যে শোষণের চিত্রই ফুটে উঠেছে।

'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসেও সুধাংশু বড়ো মেয়ে ফাল্গুনীর মাধুরীর মতো পরিণতি হয়েছিল। বিয়ের আগে পাত্র সম্পর্কে সেভাবে খোঁজ খবর না নিয়ে শিকলভাঙার অরবিন্দ জলদাসের সঙ্গে বড়ো মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল সুধাংশু। কিন্তু পরে ঘটনাক্রমে সুধাংশু এক দুঃসম্পর্কের পিসি সুশীলার কাছে অরবিন্দর আসল চেহারা ব্যক্ত হয়। জানা যায় 'প্রতিশোধ' গল্পের বিচিত্রবীর্যের মতো সেও জুয়ারি, মদমাতাল ও চরিত্রহীন। অরবিন্দের শাশুড়ি হিসেবে ফাল্গুনীর ওপর নানা অত্যাচার করেছে। অরবিন্দের মা সম্পর্কে সুশীলা পিসির বক্তব্য-

'যে বেডির বিয়ার দুই মাসের মইধ্যে বেয়াইয়ের লগে এমুন ভাষায় কথা কইতে পারে, হে পুতের বউয়ের লগে কী বেবহার কইরব বুইঝা লও। ওই দজ্জাল বেডির যন্ত্রণায় টিকতে না পাইরা বড়ো পোলা বউ লইয়া গেরাম ছাড়ছে।' (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৭৮)

অন্যদিকে 'আহব ইদানীং' গল্পে দেখা যায়, কালামউদ্দিন নামক একজন মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধকালীন গুরুতর আঘাতে পঙ্গু হয়ে ফেরে বাড়িতে। পঙ্গুত্বের কারণে সে একটা সময়ে পরিবারের সকলের কাছেই গলগ্রহ হয়ে ওঠে। এক দুপুরে খেতে বসে ডালে লবণ কম দেখে কালাম ভাতের থালা ছুড়ে ফেলে। এই ঘটনার জেরে মেজভাই জসিম বেজায় চটে গিয়ে বলে,

'তোমার খারাপ ব্যবহার আমরা অনেক সহ্য করেছি, আর না। খাচ্ছ তো মাগনা। আমাদের কামাইয়ের টাকায় পেট পুরাচ্ছ।... আর না। তোমার পথ তুমি দেখ। তোমার সঙ্গে আমরা আর নাই।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২৭২)

প্রসঙ্গত স্মরণীয় 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর অন্যতম সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক নিপীড়িত অধীনস্তকেই নিম্নবর্গ বুঝিয়েছেন। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ১৩) সেক্ষেত্রে পঙ্গু একজন ব্যক্তি যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম এবং দৈনন্দিন সামগ্রিক কাজে অন্যের সহায়তার প্রয়োজন হয়, সেও একপ্রকার

অন্যের অধীন। অধীনে থাকতে হলে আধিপত্য স্বীকারের বদলে নিজ অস্তিত্ব প্রকাশ করার চেষ্টা করলে, অধিপতি সেখানে তাকে স্বভাববশত দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কোনো ক্ষেত্রে তা বলপ্রয়োগ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়। আলোচ্য গল্পে কালামউদ্দিনের পঙ্গুত্ব এ কথাই প্রমাণ করে। তবে শুধু তার ভাইরাই তাকে ত্যাগ করেনি, স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। সবদিক থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কোণঠাসা কালাম শেষ পর্যন্ত হুইলচেয়ারে বসে ভিক্ষুক এ পরিণত হয়েছে।

অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাসে শাশুড়ি-বউয়ের দ্বন্দ্বে উল্টো চিত্র দেখা গিয়েছে। দেখা যায়, বান্ডেল পট্টির বাসিন্দা চমনলালের পরিবারে এগারো জনের সদস্য। বাসস্থানের সংকটের কারণে বিবাহযোগ্য পুত্র শক্তিলালের বিয়ে হচ্ছে না। অনেক অসুবিধা সহ্য করে চমনলাল ছেলের বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বউ রাধিকা তাদের সংসারের সুখ নিয়ে আসেনি। কারণ

> 'রাধিকা ঠোঁটকাটা স্বভাবের। নিজের ছাড়া অন্য কারও স্বার্থের বা সুখের কথা ভাবতে সে নারাজ।... প্রথমে ননদিনীদের সঙ্গে খাটাসখুটুস শুরু হয়। মধ্যস্থতা করতে এসে শাশুড়িও খোঁচা খায় রাধিকার। মায়ের অপমানে দেবররা ক্ষেপে যায়। পারিবারিক পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে ওঠে।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১০১)

পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়, যখন রাধিকা শক্তিলালকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা বলে। শক্তি প্রথমে ইতস্তত বোধ করলেও রাধিকার কূটচালে হার মেনে অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সকলে আটকানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। বাবা চমনলাল তাকে বোঝায়-

> 'তুমি চলে গেলে সমাজে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে।... বউয়ের প্ররোচনায় ভদ্রসমাজে বাসা নিতে চাইছো তুমি?' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১০১)

শক্তির উদাসীনতা দেখে চমনলাল রাধিকার কাছে অনুনয় করে। কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অটল। সাংসারিক কাজকর্ম থেকে মুক্তি পেতে স্বামীকে ভুল বুঝিয়ে মাতা-পিতা পরিবার থেকে পুত্রকে পৃথক করেছে রাধিকা। সেদিক থেকে শক্তিলালকে নিয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করার সিদ্ধান্ত পারিবারিক বঞ্চনাকেই প্রমাণ করেছে।

৪.১.১.৪ সামাজিক অন্যান্য শোষণ ও বঞ্চনা

'কসবি' উপন্যাসে রহিজ পাগলা চরিত্রটি সামাজিক শোষণে প্রাণ হারায়। দেখা যায়, পতিতাপল্লির কালু সর্দার তার মা শৈলবালার কাছে জানতে পারে মোহিনী একজন জেলেনারী। অবৈধ সম্পর্ক প্রকাশ্যে আসায় জেলেপাড়া থেকে উৎখাত হয়ে সে এই পতিতাপল্লিতে আশ্রয় নিয়েছে। একজন জেলেনি কালুকে

তোয়াক্কা করে না—এই ব্যাপারে কালু যথেষ্ট বিরক্ত ও অপমানিত। ফলে সে মোহিনী মাসিকে হেনস্থা করার জন্য পতিতাপল্লির রহিজ পাগলকে ডাকে। খাবারের লোভ দেখিয়ে রহিজকে জাইল্যা, জ্যাইলানি সম্পর্কিত একটি গান শিখিয়ে মোহিনীর বাড়ির সামনে প্রতিদিন গাইতে বলে কালু সর্দার। হীন-দরিদ্র-পঙ্গু রহিজ প্রতিদিন গানের বদলে খাওয়ার পাওয়ার আশায় ওই একই গান গেয়ে যায়। মোহিনীর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাকে অপমানিত করার জন্য কালু রহিজকে দিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। মোহিনীও দমে থাকার পাত্রী নয়, সে প্রেমদাসকে দিয়ে রহিজ পাগলকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, কেন সে কালুর কথায় এই কাজ করেছে। রহিজ জানায়,

> 'সর্দার লোভ দেখাইল—দুইবেলা ভাত দেব, মদ দেব। বিনিময়ে শুধু একখান গান গাইবি—জাইল্যা-জাইল্যানির গান। খাওনর লোভে রাজি অইয়া গেলাম। গান গাইতে তো আমার কষ্ট হয় না। খাইতে না পাইলে বড়ো কষ্ট হয় আমার।'
>
> (জলদাস ২০১১, পৃ. ৯৯)

একজন নিঃস্ব, হতদরিদ্র মানুষের ক্ষুধার যন্ত্রণা সুযোগ নেয় মোহিনী মাসিও। রহিজকে দু'বেলা ভাত ও টাকা দেওয়ার বিনিময়ে কালু সর্দারের বাড়ির সামনে চিৎকার করতে বলে। রহিজও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে শিখিয়ে দেওয়া ছড়া কাটতে থাকে,

> 'ওই হারামজাদা ইবিলিস, সর্দারের ঘরে সিফিলিস, ঘরের ভিতর যাইস না, পোকা আম খাইস না।'
>
> (জলদাস ২০১১, পৃ. ১০০)

এই কথা শুনে কাস্টমাররা সর্দারের দরজা থেকে সরে যায়। কালুর সমূহ ক্ষতি হয়। ক্রোধে জর্জরিত কালু রহিজ পাগলার খোঁজ করে এবং তিন দিন পর মোহিনী মাসির দরজার সামনে রহিজ পাগলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।

প্রচলিত প্রবাদ আছে যে- 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।' রহিজ পাগল এক্ষেত্রে উলুখাগড়ায় পরিণত হয়েছে। লক্ষণীয় রহিজ পাগলকে কাজে লাগিয়ে দুই পক্ষের সংগ্রাম ও ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি কিন্তু মাঝখান থেকে নিঃস্ব, হতদরিদ্র ও বিকৃত মস্তিস্কের একজন নিম্নবর্গকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষক বিদ্রোহের প্রসঙ্গে কৃষক চৈতন্যের সম্পর্কে আধিপত্য ও নিম্নবর্গের কথা বলতে গিয়ে বলেন-

> 'One there by has the means to conceptualize the unity of that consciousness as grounded in a relationship of power, namely, of domination and subordination. Peasant consciousness, then is a contradictory of two aspects: in one, the peasant is subordinate where he accepts the immediate reality of power relations that dominate and exploit him; in the other he denies those conditions of subordination and asserts his autonomy.' (Chaturvedi (ed.) 2000, p.17-18)

অর্থাৎ কৃষক চৈতন্য হল আধিপত্য ও অধীনতার একটি বিরোধী ঐক্য যার দুটি দিক রয়েছে। একটিতে কৃষক হল একজন অধীনস্ত, যেখানে সে ক্ষমতার সম্পর্কের তাৎক্ষণিক বাস্তবতাকে মেনে নেয় যা তাকে অধীনস্ত ও শোষণ করে এবং অন্যদিকে একজন কৃষক অধীনতার শর্তগুলিকে আস্বীকার করে তার স্বায়ত্ত শাসন দাবি করে।

আলোচ্য উপন্যাসে রহিজ পাগলের ক্ষেত্রে আমরা আধিপত্য ও অধীনতার বিরোধী ঐক্যের প্রথম দিকটিকে লক্ষ করেছি, যেখানে রহিজ একজন অধস্তন নিম্নবর্গ এবং সে সামান্য খাবারের আশায় ক্ষমতার সম্পর্কের তাৎক্ষণিক বাস্তবতাকে মেনে নেয় যা পরবর্তীকালে তার প্রাণ নাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে নিরক্ষরতা বা শিক্ষাহীনতা যে শোষিত শ্রেণির উৎপত্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তা 'কসবি' উপন্যাসে জানা যায়। তাইতো কালু সর্দার এবং দলবল কৈলাসকে পতিতাপল্লির জারজ সন্তানদের শিক্ষিত করে তুলতে বাঁধা দিয়েছে। শিক্ষাকে তারা শত্রু ভাবে, কারণ তারা জানে,

> 'শিক্ষিত মানুষ প্রতিবাদী হয়। অশিক্ষিতদের সহজে শোষণ করা যায়। অশিক্ষিতরা নির্বিরোধী। পতিতার সন্তানরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে তারা সচেতন হবে, অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। তখন মাসি-সর্দার-দালাল-মস্তানদের শোষণযন্ত্র বিকল হয়ে পড়বে'। (জলদাস ২০১১, পৃ ১১৩)

ভবিষ্যতে শোষণ যন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কৈলাসকে চিরতরে থামিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করে কালু সর্দাররা। কারণ কৈলাস শুধু ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষিতই করছে না, বরং পতিতাদের মধ্যেও অধিকার বোধ জাগিয়ে তুলেছে। তাই তো ক্ষমতার বলে কালু তার পোষা গুণ্ডাদের দিয়ে কৈলাসকে হত্যা করিয়েছে গোপনে। চার-পাঁচদিন পর কৈলাসের লাশ পাওয়া গিয়েছে পাতকুয়ার মধ্যে। আধিপত্য ও শোষণের মূল একক যে ক্ষমতা তা দেবযানী নামক পতিতা জীবন অভিজ্ঞতায় বুঝতে পেরেছে। সে কালু সর্দার দ্বারা এই অন্যায়-শোষণের ভবিষ্যৎ আন্দাজ করতে পারে। তার ভাবনায়-

> 'একটা সময় কৈলাস হত্যার হইচই স্তিমিত হয়ে আসবে। কালু টাকা দিয়ে থানা বশ করবে, উকিলদের মুখ বন্ধ করবে, দু'চার ছয় মাস কেটে গেলে কালু আবার এই পতিতাপাড়ায় সাঙাতদের নিয়ে ঘুরবে। ঘরে ঘরে চাঁদা তুলবে, একে তাকে মারবে, ধমকাবে। আর মোহিনী মাসির বাড়ির সামনে এসে ওপর দিকে তাকিয়ে শ্লেষের হাসি হাসবে। তখন মোহিনী মাসির করার কিছুই থাকবে না,...' (জলদাস ২০১১, পৃ ১৬১)

কালু সর্দার এই বেশ্যাপাড়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। তার ইচ্ছাতেই পতিতাপল্লির গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়। শুধু পতিতারাই নয়, মাসি-মস্তানরাও তার হাতে প্রায় প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হয়েছে। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য হত্যা পর্যন্ত করেছে কালু সর্দার। তাহলে দেখা গেল, ক্ষমতার শৃঙ্খলে সমাজ শ্রেণিবিভাজিত হওয়ার দরুন একপক্ষের কাছে অপরপক্ষকে শোষিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, বঞ্চিত ও

নিপীড়িত হতে হয়েছে। আর এসব সংঘটিত হয়েছে তখনই যখন অপেক্ষাকৃত শক্তিধর ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে অধস্তন ব্যক্তি ক্ষমতার সম্পর্কের তাৎক্ষণিক বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছে।

একই ঘটনা দেখা যায়, 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' উপন্যাসে। আবুল কাশেম চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। ইউনিয়ন তার কথায় ওঠে-বসে। অর্থাৎ ক্ষমতার বলে সে তার চারপাশের বলয়কে অধস্তন হিসেবে শাসন ও শোষণ করেছে। জানা যায়, আবুল কাশেমের চোখ পড়েছে কুমোরদের শ্মশানের ওপর।

'বড়ো সুন্দর জায়গা। দিনে দিনে কঠিন পরিশ্রম করে কুমোররা কাঁকরির মাটি এনে এনে শবদাহের জায়গাটি ভরাট করেছে। নানা ধরনের গাছ শ্মশানজুড়ে। ...সেগুন গাছই বেশি। শ্মশানের সমস্ত গাছের দাম বর্তমান বাজারমূল্যে কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

চেয়ারম্যান আবুল কাশেমের খায়েশ হয়েছে—ওই জায়গায় একটা বাগানবাড়ি করবে'।

(জলদাস ২০২০, পৃ. ৯৬)

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবুল তার দলবল নিয়ে কুমোরপাড়ায় উপস্থিত হয় এবং কুমোরদের জানায় শ্মশানটি তার খুব পছন্দ, সেখানে সে একটি এবাদতখানা বানাতে চায়। মানুষকে দাহ করার জন্য এত বড়ো জায়গার বদলে অন্য জায়গায় একটি শ্মশান বানিয়ে দিতে চায় সে। আবুলের এই প্রস্তাবে মালো পাড়ার হর্তাকর্তারা চুপ করে থাকে। তাদের চুপ থাকতে দেখে সে বলে-

'চুপ থাইকো না তোমরা। ভাবাভাবির দরকার নাই। যা কইলাম, মাইনা নেও, রাজি হইয়া গেলে আখেরে তোমাগোর লাভ। কথা দিতাছি, লাভ ছাড়া লোকসান অইব না তোমাগো'। (জলদাস ২০২০, পৃ. ৯৮)

আবুল কাশেমের শাসন-ক্ষমতা ও অনুরোধের মিশেলে তৈরি প্রস্তাবটি আমাদের গ্রামশি কথিত 'হেজেমনি'-র কথা স্মরণ করায়। ইতিপূর্বে প্রথম অধ্যায়ে (বিস্তারিত আলোচনা, পৃ. ১৭-২১) আমরা জেনেছি- আধিপত্যের মূল কথা হল—শক্তি প্রয়োগ না করে সম্মতি আদায়ের মধ্য দিয়ে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা। এক্ষেত্রে আবুল কাশেম মিশেল ফুকোর ক্ষমতায়নের ভিত্তিতে 'Love of the master' (প্রভুর ভালোবাসা) প্রদর্শন করতে চেয়েছেন প্রাথমিকভাবে। কারণ আধিপত্যের অর্থ সরাসরি বল প্রয়োগ করা নয় বরং অধস্তনদের সর্বসম্মতি আদায় করা হয় এমনভাবে যাতে মনে হয়, তাদের ভালোর জন্যই একাজ করা হচ্ছে বা হবে। ফুকোর মতে এটি ক্ষমতা প্রয়োগ করার কৌশল মাত্র। আলোচ্য গল্পেও আবুল কাশেম অন্য একটি শ্মশান গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং কুমোরদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে এই বলে যে, লাভ ছাড়া তাদের লোকসান হবে না। পূর্বপুরুষের বহু প্রাচীন ঐতিহ্যময় শ্মশান ছেড়ে দিলে তাদের কোনো লোকসান হবে না—এই কথাটির আড়ালে আসলে আধিপত্যকেই নির্দেশ করছে। কিন্তু এই আধিপত্য ও

অধীনতার বিরোধী ঐক্যের মধ্যে নিম্নবর্গ যখন অধীনতার শর্ত অস্বীকার করে স্বায়ত্তশাসন দাবি করে তখন নিম্নবর্গের মধ্যে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। কুমোরদের সমাজের প্রধানরা যখন অধীনতা মেনে নিয়ে নিশ্চুপ তখন অধীনতার শর্ত লঙ্ঘন করে কুন্তী প্রতিবাদ করে উঠেছে। আর ঠিক সেই সময়ে আধিপত্যের ভিত্তিতে আবুল কাশেম তার দলবলের সাহায্য নিয়ে কুমোরদের ওপর শক্তি প্রদর্শন করেছে।

...ফখরে আলমরা কুমোর-কৈবর্তদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এত কিরিচ, এত রামদা, এত বল্লম, এত লাঠিসোঁটা কোথায় ছিল কে জানে! আক্রমণকারীদের হাতে হাতে মারণাস্ত্র'। (জলদাস ২০২০, পৃ. ১১৮)

দেখা গেল, আবুলদের আক্রমণে কুমোর-কৈবর্তরা কেউ কেউ পালিয়ে বাঁচল। শহীদুল কুন্তীর শাড়ি খুলে ফেললে সম্মান বাঁচানোর জন্য নিরূপায় কুন্তী কাঁকরি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অন্যদিকে 'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাসটিতে মৎস্য সমাজের আড়ালে মানব সমাজের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। যেখানে দেখা যায় জেলে-মেথর-পতিতা সমাজের মতোই মৎস্য সমাজেও সর্দার রয়েছে। এই সর্দারের হাতেই সমগ্র গ্রামের দায়ভার। ক্ষমতার লোভে পঞ্চু তার পিতা বিনোদকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করিয়ে নিজে সর্দারের পদ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। উপন্যাসে জানা যায়, পঞ্চুর আমলে জলধি গ্রামের মৎস্য সমাজে মাৎসান্যায় শুরু হয়। কারণ,

'সর্দার হয়েই পঞ্চু শাসনের সঙ্গে শোষণকে যুক্ত করল। সে কোনো নিয়ম-প্রথার তোয়াক্কা করল না। সততা আর সুবিচার তার কাছে উপেক্ষিত হলো।... পঞ্চু সেখানে প্রতিষ্ঠা করল পেশিশক্তির রাজত্ব। সে একটি মাস্তান দল তৈরি করল। মাস্তান দলের নিপীড়নে গোটা গাঁয়ের মাছেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল'। (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ.১৮)

লক্ষণীয় পেশি শক্তির রাজত্ব অর্থাৎ ক্ষমতার ভিত্তিতে শাসন। সেই ক্ষমতা একক কোনো ব্যক্তির নয়, তা সমষ্টিগত। কারণ পঞ্চু জলধি গ্রামের সর্দার নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পদমর্যাদা ও পদের ক্ষমতার আসক্তিতে চারপাশ থেকে সে কিছু শক্তিশালী কর্মঠ মাছেদের নিয়ে একটি মস্তান দল তৈরি করার সুযোগ পেয়েছে। যার দ্বারা সে মৎস্য সমাজে আধিপত্য বা হেজেমনি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই আধিপত্য সৃষ্টির পর জলতলের সমাজে বিশ্বাসঘাতকতা, অপমান, লাঞ্ছনা, নারী অপহরণ, শোষণ-বঞ্চনার মাত্রা বৃদ্ধি পায় স্বাভাবিকভাবেই। আমরা জানি সুশাসনের মূল ভিত্তি নিরপেক্ষতা। অন্যদিকে পক্ষপাতিত্বের শাসনে প্রদর্শিত হয় আধিপত্যের জোর, যা একই সঙ্গে কুশাসনকেও প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীকালে তা শোষণ বঞ্চনায় পরিণত হয়। আলোচ্য উপন্যাসে তাই পঞ্চুর স্ত্রী যমুনা তার ছেলে জগাইকে তার হতাশার কথা বলতে গিয়ে বলেছে-

‘তোর বাপ সরদারিটা ভালা চালাইতেছে না। বিচার করে নাকি পক্ষ টাইনা। অসহায় মাছেরা সুবিচার থেইকে বঞ্চিত হয়’। (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ৫১)

সুবিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রজারা প্রশাসনের কাছে এইভাবে শোষিত হয়েছে। গ্রামশি নাগরিক সমাজকে চালনা করার জন্য যে হেজেমনি বা আধিপত্যের কথা বলেছিলেন সেখানে তাঁর বক্তব্যের মূল ভিত্তি ছিল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ। তাঁর মতে-

‘…the supremacy of a social group or class manifests itself in two different ways: ‘domination’ (dominio) or coercion, and ‘intellectual and moral leadership’… This latter type of supremacy constitutes hegemony. Social control, in other words. Such ‘internal control’ is based on hegemony.” (Jesph 1981, p. 24)

অর্থাৎ সামাজিক প্রভাব বিস্তারের দুটি পথ হল—এক, আধিপত্য বা ডোমিনেশন এবং দুই, জবরদস্তি করা, বাধ্য করা বা ভয় দেখান। দেখা গেল সামাজিক প্রভাব বিস্তারকারী কোনো মানুষ যখন দ্বিতীয় পন্থা অর্থাৎ জোর করা, বাধ্য করা বা ভয় দেখানর পথ অবলম্বন করে, তখন সেখানে সাধারণ নাগরিক বা মানুষ শোষিত হয়। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে সামাজিক শোষণের যে রূপ আমরা দেখলাম তা আসলে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারে গ্রামশি কথিত দ্বিতীয় পন্থার অনুসরণকারী যেখানে ক্ষমতা একটি বিশিষ্ট ভিত্তি রূপে কাজ করেছে।

৪.১.২ অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা

সমাজ অন্তর্ভুক্ত মানুষ অর্থনৈতিকভাবে প্রতিনিয়ত কীভাবে শোষিত ও বঞ্চিত হচ্ছে তার বিস্তৃত আলোচনা করার আগে অর্থনীতি সম্পর্কে মার্কসের সমাজ অভিব্যক্তিগুলিকে দেখে নিতে হয়। মার্কসের সমাজ চিন্তায় শ্রেণি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কার্ল মার্কসের সামাজিক অভিব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে দুটি বিষয় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে—এক. উৎপাদন ব্যবস্থা এবং দুই. উৎপাদন ব্যবস্থা উদ্ভূত নানা পারস্পরিক সম্পর্ক। আসলে কোনো বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থায় যে শ্রেণির কাছে উৎপাদনের মালিকানা থাকে সেই শ্রেণি অন্যান্য শ্রেণির ওপর প্রভূত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়। অন্যদিকে উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন হলে সামাজিক সম্পদেরও পরিবর্তন হয়। ফলে উৎপাদনের মালিকানারও পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে শ্রেণিতে শ্রেণিতে স্বার্থ সংঘাতের ফলে বিরোধী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কার্ল মার্কস পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় প্রধানত তিনটি শ্রেণির উল্লেখ করেছেন। i. ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়া—যারা পুঁজির নিয়ন্ত্রক ii. ভূস্বামী—যারা ভূমি বা জমির স্বত্বাধিকারী এবং iii. শ্রমিক শ্রেণি—উৎপাদন কার্যে প্রয়োজনীয় শ্রম সরবরাহ করে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই তিন শ্রেণির উৎপাদকের উপস্থিতি ব্যাহত হলে উৎপাদন প্রক্রিয়াও ব্যাহত হয়। কিন্তু মার্কসের মতে

পুঁজিবাদী শ্রেণির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির সম্পর্ক আসলে বিরোধী সম্পর্ক, অর্থাৎ শোষক-শোষিতের সম্পর্ক। কারণ পুঁজিবাদীরা মুনাফা হিসেবে শ্রমিকের শ্রমকে উদ্বৃত্ত হিসেবে শোষণ করে। সুতরাং শোষণের উপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী কাঠামো গড়ে ওঠার অবকাশ পায়। (কর ১৯৬৫, পৃ. ১১৩)

পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামো শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের রূপান্তর ঘটেছে সমাজের সর্বস্তরে। শুধুমাত্র অর্থের জোরে ক্ষমতায়নকে কুক্ষিগত করা এবং তা জনসাধারণের ওপর প্রয়োগ করার অর্থ শাসন করা হলেও শোষণ নয়। শোষণ ও বঞ্চনার রূপ প্রকাশিত হয় তখনই যখন সমাজে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে পুঁজির মালিক ক্ষমতার জোরে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে—তা সে বল প্রয়োগ করেই হোক বা বুদ্ধি প্রয়োগ করে। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজের ক্ষেত্রেও এ ধরনের অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে।

আসলে সমাজ গঠন প্রক্রিয়ার পরবর্তীকালে দাসপ্রথা-ভূমিদাসপ্রথা-সামন্তপ্রথা থেকে পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া শ্রেণির উৎপত্তি হওয়া পর্যন্ত সমাজ তিনটি স্তরে বিভক্ত হয়ে আছে আজও। অর্থাৎ একদিকে শাসকবর্গের শাসন-শোষণ, অন্যদিকে শাসকবর্গকে সহায়তা প্রদানকারী মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি। এই দুটোর মাঝে আবহমান কাল ধরে পিষ্ট হয়ে আসছে নিম্নবর্গ। ত্রিস্তরীয় এই সমাজ বিন্যাসর মধ্যে রয়েছে সামাজিক ক্ষমতার বিন্যাস, প্রতিষ্ঠা, প্রভুত্ব, এবং পুনরাবর্তনের প্রক্রিয়া। লক্ষণীয়, উৎপাদক শ্রেণি হিসেবে নিম্নবর্গীয় মানুষের শ্রম শোষণ যন্ত্রে নিষ্পেষিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। নিম্নবর্গের মধ্যে যেমন আছে অন্ত্যজ, দলিত শ্রমজীবী মানুষ এবং অন্যদিকে আছে জীবিকাহীন অতিদরিদ্র মানুষেরাও। সেক্ষেত্রে নিম্নবর্গীয় সমাজ একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার স্বরূপ। কিন্তু সেখানেও ক্ষমতার শৃঙ্খলায় নানাবিধ শ্রেণিবিভাজন রয়েছে। জাতিগত উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ, বর্ণভেদ, শিক্ষিত অশিক্ষিতর মধ্যে ভেদাভেদ ও সর্বোপরি অর্থ ও ক্ষমতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাজন। নিম্নবর্গীয় সমাজে বসবাসকারী একজন নিম্নবর্গের মানুষ আলোচ্য শ্রেণিবিন্যাসের ফলে আরো কোণঠাসা ও শোষিত হয়েছে। সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর 'Can the subaltern speak?' প্রবন্ধে রণজিৎ গুহের 'এলিট' ও 'সাবঅলটার্ন ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ক্ষমতা ও আধিপত্যের ভিত্তিতে সমাজ কাঠামোকে তিনটি স্তরে সাজিয়েছেন এভাবে,

ELITE : 1. Dominant foreign groups.

2. Dominant indigenous groups on the all-India level.

3. Dominant indigenous groups at the regional and local levels.

4. The terms "people" and "subaltern classes" have been used as synonymous throughout this note. The social groups and elements included in this category represent the demographic difference between the total Indian population and all those whom we have described as the "elite."

(Morris (ed.) 2010 p. 253)

হরিশংকরের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সমাজ যেভাবে চিত্রায়িত হয়েছে সেখানে উপরিউক্ত সমাজ কাঠামোকে সরাসরি সেভাবে লক্ষ করা না গেলেও অপেক্ষাকৃত অধস্তনের সঙ্গে ক্ষমতার ভিত্তিতে এক ধরনের শ্রেণিবিন্যাস সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, কথাবিশ্বে জেলেসমাজ সম্পর্কে জানা যায়, জেলেদের জনবলের অভাব নেই। অভাব শুধু টাকার। বেশিরভাগ জেলে অত্যন্ত গরীব ইতিপূর্বেই জেলেদের পেশা ও উপার্জনের ভিত্তিতে জেলে সমাজ শ্রেণি বিভাজিত। সচ্ছল জেলেদের নিজস্ব নৌকা- জাল আছে। এরা সমাজের বহদ্দার। এদের মধ্য থেকেই সমাজের সর্দার নির্বাচিত হয়। বহদ্দারদের নৌকা সহায়ক হিসেবে কাজ করা জেলেদের বলা হয় পাউন্যা নাইয়া এবং এর নিচুস্তরের রয়েছে ছোটো মাপের জাল সম্বলিত সাধারণ জেলে ও বিয়ারিয়া। অর্থাৎ জেলের সমাজও শাসকবর্গ-সহায়কবর্গ ও নিম্নবর্গ এই তিন শ্রেণিতে বিভাজিত। ফলে এক্ষেত্রে শোষণের প্রকৃতি অর্থনৈতিক ভিত্তিক।

৪.১.২.১ ঋণজনিত শোষণ-বঞ্চনা

'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখি উত্তরপতেঙ্গা গ্রামের জেলেপাড়ায় দশজন বহদ্দার রয়েছে। এদের মধ্যে বিজনবিহারী, পূর্ণচন্দ্র, কামিনীমোহন, রামনারায়ণ নামকরা বহদ্দার। যদিও জেলেপাড়ার অন্যান্য জেলেরা সব বহদ্দারকে সমানভাবে পছন্দ করে না। দু-একজন ছাড়া অধিকাংশ বহদ্দার মাছ মারার মরশুমে শুধু নিজেদের স্বার্থ দেখে। আর ওই স্বার্থসিদ্ধির থেকে শোষণ-বঞ্চনার সূচনা হয়। দেখা যায়, বহদ্দাররা নিজেদের নৌকার সহায়ক হিসেবে পাউন্যা নাইয়াকে ব্যবহার করে। এই ব্যবহার করার নামে চলে শোষণপ্রক্রিয়া। আধিপত্যের ভিত্তিতে বহদ্দাররা বাইরে থেকে এ-সত্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে যে- তারা পাউন্যা নাইয়ার মঙ্গলার্থে নানা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু আড়ালে রয়েছে নানা ছলচাতুরী।

> 'তাদের খাটিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে এরা। এরকম স্বার্থসন্ধানী, লোভী বহদ্দারদের একজন বিজনবিহারী। তার নৌকায় পাউন্যা উঠতে তাই অনেকে নারাজ। ওর নৌকায় পাউন্যা উঠলে লাভের আশা দূরে থাক, বিরাট আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৪৩)

জেলেসমাজের মধ্য থেকে সাধারণ ও পাউন্যা জেলেরা বহদ্দারের দ্বারা শোষিত হয়েছে এবং বহদ্দাররাও শোষিত হয়েছে দাদনদারদের হাতে। আমরা পূর্বেই দেখেছি জেলেদের মাছ ধরার কাজে জনবলের পাশাপাশি অর্থবলেরও প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে নিজস্ব জাল-নৌকা সম্বলিত জেলেরা অর্থাৎ বহদ্দাররা মাছমারার মরশুমে নৌকা- জাল ও অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য সবসময় নিজেদের সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট হয় না। তখন বাধ্য হয়ে তারা দাদনদারদের কাছ থেকে অর্থ ঋণ নেয়। উপন্যাসে উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের

জেলেপাড়ায় দাদনের ব্যবসা আব্দুস শুক্কুর ও শশিভূষণ রায় নামক দুজন ব্যক্তি কুক্ষিগত করে রেখেছে। জানা যায়, এই দুজন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে দাদন নেওয়ার উপায় নেই জেলেদের। কারণ কেউ দাদন দিতে চাইলেও শুক্কুর ও শশিভূষণের কূটকৌশলে তারা দাদনের ব্যবসা থেকে সরে গিয়েছে। দাদনের নামে নানা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে তারা অশিক্ষিত জেলেদের বংশানুক্রমে ঠকিয়ে শোষণ ও বঞ্চনা করেছে। 'জলপুত্র' উপন্যাসে জানা যায়,

'দুটো শর্তে এরা জেলেদের ঋণ দেয়। মাসিক শতকরা দশ টাকা সুদে যত মাছ ধরা পড়বে, তার সবই দাদনদারের দামে তাদেরই কাছে বিক্রি করতে হবে। জেলেরা নিরুপায়। দু'একটা পরিবার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার-উধার করে মাছ ধরার ব্যবসায়ে নামলেও অধিকাংশ শুক্কুর- শশির ফাঁদে জড়িয়ে যায়। আর একবার তাদের কাছ থেকে যারা ঋণ নেয়, তারা বংশানুক্রমে সেই ঋণ থেকে মুক্তি পায় না।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.৪২)

উত্তর পতেঙ্গার কামিনী বহদ্দার প্রত্যেক বছরের মতো শুক্কুরের কাছ থেকে দাদন নিয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার বাজারদরে কামিনীর কাছ থেকে মাছ কেনার কথা। কিন্তু শুক্কুর জলের দামে সেই মাছ কামিনীর কাছ থেকে কিনতে চাইলে কামিনী এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি ও বচসার জেরে শুক্কুর কামিনী বহদ্দারকে চড় মারে। উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে,

'খানকির পোয়া, ডোমর বাইচ্যা, টিয়া লইতর সমত্ হুঁশ নো আছিল? আব্বারে মাছ দওনর কথা ভুলি গেইয়চ দে না?'

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ৫২)

লক্ষণীয় 'আব্বারে' শব্দ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে অর্থ ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশিত হয়েছে শুক্কুরের মধ্যে। 'আই যেই রইম্যা দাম দিয়ম, হেই দামে বেচিবি দে'- হুমকির মধ্য দিয়ে শুক্কুরের বল প্রয়োগ ও শোষণের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু শশিভূষণ দাদনদারের চরিত্রটি অন্যরকম। সে নাগরিক সমাজের বুদ্ধিজীবীদের মতো। শুক্কুর-শশিভূষণের আধিপত্য বিস্তারের দুই পৃথক অভিমুখ। শুক্কুর স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছে বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শশিভূষণ কৌশল প্রয়োগ করে জেলেদের সম্মতি আদায় করতে সচেষ্ট। তাইতো শুক্কুর কামিনীকে চড় মারলে জেলেদের উত্তেজনাকে কৌশলে থামিয়ে দিয়েছে সে।

"শুক্কুর মিয়া, তুঁই ই'ন কিইল্যা? জাইল্যার গাআত্ হাত! ঠিক নো গর। হিতারার কারণে আঁরার বেবসা। তুঁই হিতারারে অপমান গরি পাপের কাম গইয্যো' বলতে বলতে কামিনীর গায়ে ও মাথায় হাত বুলাতে লাগল ষটোত্তর শশিভূষণ"

(জলদাস ২০০৮, পৃ.৫৩)

জেলেদের বেদনার সঙ্গে সমবেদনা পোষণ করে শশিভূষণ শুক্কুরের হয়ে জেলেদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয় তৎক্ষণাৎ। শশিভূষণের এই কুটকৌশল আর কেউ না বুঝলেও শুক্কুর বুঝতে পারে-

'...এটা শশিভূষণ মহাজনের চাল। জেলেদের না ক্ষেপিয়ে শোষণ করার চালটি বুঝতে তার দেরি হল না।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ.৫৩)

উপন্যাসে দেখি, দাদনদাররা ইলিশের মরশুমকে কেন্দ্র করে টাকা লগ্নি করে এবং তাদের শোষণ প্রক্রিয়াকে সচল করে। ইলিশের মরশুম শেষ হলে তারা জেলেদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ করতে বসে। আর স্বাভাবিকভাবেই সেই হিসেবে থাকে প্রচুর গোঁজামিল, অশিক্ষিত জেলেদের সঙ্গে ছলচাতুরি করার জন্য গোঁজামিলের মতো নিরাপদ ও সুবিধাজনক পথ দ্বিতীয় নেই দাদনদারদের কাছে। দেখা যায়, মরশুমের সময় তারা জেলেদের সব 'জোআ'র টাকা পরিশোধ করে না। বরং জেলেদের বলে যে হিসেব খাতায় লেখা আছে। সহজ-সরল জেলেরা তাদের কথায় আস্থা রাখে, কিন্তু মরশুম শেষে জেলেদের হিসেবের সঙ্গে দাদনদারদের হিসেবের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। জেলেদের মুখের হিসেবের মূল্য দেয় না তারা, বরং তাদের গোঁজামিল দেওয়া হিসেবের খাতা জেলেদের সামনে তুলে ধরে দাদনদারেরা। তখন নিরুপায় জেলেরা নিজেদের অশিক্ষিত ভেবে দাদনদারদের কথা বিশ্বাস করে। 'জলপুত্র' উপন্যাস দেখা যায় রফিকের চায়ের দোকানে এবছরের জেলেদের সঙ্গে হিসেব নিয়ে বসে শুক্কুর ও শশিভূষণ। জেলেদের চোখে মুখে চাপা আনন্দ, কারণ এবার তারা ঋণ অনুযায়ী প্রচুর মাছ দিয়েছে দাদনদারদের। ফলে ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার দিন আজ। কিন্তু হিসেবের খাতা প্রকাশ্যে এলে দেখা যায়- মহিম পাউন্যা নাইয়া শশিভূষণের কাছ থেকে তিনহাজার টাকা দাদন স্বরূপ নিলেও মাছের দাম অনুযায়ী তা শোধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু শশিভূষণের গোঁজামিল হিসেব অনুযায়ী মহিম তাকে দুই হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকার মাছ দিয়েছে। ফলে আরো আড়াইশ টাকা মহিমের কাছে পাওনা দাবি করে শশিভূষণ। আসল হিসেব অনুযায়ী মহিমের সম্পূর্ণ টাকা শোধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আরো আড়াই'শ টাকা ঋণ অবশিষ্ট শুনে অবাক মহিম অসহায় বোধ করে। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই বাড়তি আড়াই'শ টাকা শশিভূষণ মহিমকে ঠকিয়ে নিতে চেয়েছে। মহিম হিসেবে সন্দেহ প্রকাশ করলে, তাকে থামানোর জন্য শশিভূষণ পূর্বাপর কৌশলে জেলেদের সমর্থন ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য বলে ওঠে,

> 'তোঁয়ারা হইয়ো যে আঁরার আত্মার আত্মীয়। জাত আলাদা হইলে কি অইবো। বিয়ানে উডিবার সময় একজন আরেকজনের মুখ দেখি, হেই মাইন্ষেরে ফাঁকি দিলে ঈশ্বর মাফ না গরিবো। তোঁয়ারা আঁরার উঅদ্দি বিশ্বাস রাখ। তোঁয়ারারে আঁরা কনোদিন ঠগাইতাম নো'। (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৯০)

স্বাভাবিকভাবেই সরল জেলেদের কাছে শশিভূষণের এই কৌশল সফল হয়। অন্যান্য ঋণগ্রহীতারা বিনা প্রতিবাদ ও সন্দেহে শশিভূষণের কাজ থেকে হিসেব বুঝে নেয়। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় কামিনী বহদ্দারের সঙ্গে শুক্কুর মহাজনের। কারণ হিসেব অনুযায়ী কামিনীর ঋণ ও মাছের দাম সমান-সমান। কিন্তু কামিনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে দয়াল মাস্টারের কাছে প্রতিদিনের মাছের হিসেবে রেখেছে। সেই খাতার হিসেব

অনুযায়ী কামিনী উল্টে শুক্কুরের কাছে দেড় হাজার টাকা পায়। শুক্কুর ভেবেছিল প্রতিবছরের মতো এবারও মিথ্যে হিসেব দিয়ে পার পেয়ে যাবে- কিন্তু কামিনী হিসেবে রাখার পদক্ষেপে শুক্কুর ফেঁসে গিয়েছে।

'দুটি খাতা পরীক্ষার পর দেখা গেল, কামিনীর খাতাই ঠিক। শুক্কুর তার খাতায় টাকার সংখ্যা ঠিকই লিখেছে। কিন্তু যোগফল লিখে রেখেছে কম। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও সে ভেবেছিল মিথ্যে হিসেব দিয়ে পার পেয়ে যাবে।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ৯১)

সেখানে উপস্থিত জেলেরা বুঝে যায়, এতদিন ধরে দাদনদারেরা তাদের কতটা ক্ষতি করেছে। ফলে নিজেদের শোষিত বঞ্চিত হতে দেখে জেলেরা ঠিক করে তারা কেউ আর শুক্কুর-শশিভূষণের কাছ থেকে দাদন নেবে না। জেলেদের এই পদক্ষেপে দাদনকারীরা জেলেদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য কূটকৌশল প্রয়োগ করেছে। এতদিন তারা টাকা নয়-ছয় করে জেলেদের ঠকিয়েছে। এবার তারা জেলেদের অন্ন যোগাবার রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা প্রতিবেশী অঞ্চল সন্দ্বীপ থেকে মুসলমান মাছমারাদের ভাড়া করে এনে সমুদ্রে জেলেদের নির্ধারিত স্থানে জাল পাতে। ফলে-

'জেলেপাড়া হইচই পড়ে গেল। এতদিন সমুদ্রটা তাদের এক্তিয়ারে ছিল। আজকে ভাগ বসাচ্ছে শুক্কুর ও শশিভূষণ। এক অজানা আশঙ্কায় জলদাসদের বুক কেঁপে উঠল।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১২২)

এই অন্যায়-বঞ্চনার প্রতিকার খুঁজে পেতে জেলেরা একত্রিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আফজালুর রহমান চৌধুরীর কাছে গেলে সে তাদের এই বিপদ থেকে বাঁচাতে অক্ষম বলে জানান। জেলেরা অসহায় ও নিরুপায় হয়ে ফিরে এলেও গঙ্গার নেতৃত্বে শুক্কুর-শশিভূষণকে মারার পরিকল্পনা করে তারা। এই খবর দাদনদারদের কাছে পৌঁছালে শুক্কুর-শশিভূষণ জেলেদের পরিকল্পনার মাথা গঙ্গাকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সংকল্প করে। গঙ্গাকে রাতের অন্ধকারে গোপনে হত্যা করায় শুক্কুর-শশিভূষণ। ক্ষমতার সামনে এভাবেই গঙ্গারা মৃত্যুর মুখে পতিত হয়।

সুতরাং দেখা গেল, উচ্চবর্গ তাদের আধিপত্য ও প্রভুত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেমন সকলের সম্মতি আদায়ের জন্য কৌশল প্রয়োগ করে, তেমনই প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ করে নিজেদের বাধাকে উচ্ছেদও করে।

৪.১.২.২ শ্রমজনিত আর্থিক শোষণ ও বঞ্চনা

'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখি বহদ্দারদের পাশাপাশি দাদনদারদের শোষণ চিত্র। কিন্তু 'দহনকাল' উপন্যাসে বহদ্দারদের সাধারণ জেলেদের প্রতি শোষণ-বঞ্চনা চিত্রটি স্পষ্ট। উপন্যাসে রাধানাথ পাউন্যা নাইয়া হিসেবে রমণী বহদ্দারের নৌকায় সহকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু রমণীমোহন

রাধানাথের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাকে বঞ্চনা করেছে। জেলে সমাজের অলিখিত অথচ অলঙ্ঘনীয় শর্ত হল- বহদ্দারের একটি জলের মাছ তোলার পর পাউন্যা নাইয়ার জাল থেকে মাছ ধরতে হবে। তারপরে বহদ্দারের অন্য জাল থেকে মাছ ধরতে পাউন্যা নাইয়ারা সাহায্য করবে। এছাড়াও নিয়ম অনুযায়ী বহদ্দারের তিনটি ও পাউন্যা নাইয়ার একটি বিহিন্দিজাল বসানোর অধিকার আছে। কিন্তু রাধানাথ পাউন্যা হিসেবে প্রথম বলে রমণীমোহন উল্লেখিত নিয়ম ও শর্ত মানেনি। সে সম্পূর্ণ অনৈতিক শর্ত আরোপ করে।

'বহদ্দার শর্ত দিল—জোআর সময় প্রথমে তার সব জাল থেকে মাছ তোলা হবে, সময় থাকলে তারপর রাধানাথের জাল থেকে'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৮)

এটি সম্পূর্ণ অনৈতিক জেনেও রাধানাথ রাজি হয়। সে জানে পাউন্যা নাইয়া হিসেবে সে নতুন বলে প্রচলিত নিয়ম ভেঙে রমণীমোহন তাকে এই অসম শর্তটি দিয়েছে। রাধানাথের শ্রমকে রমণীমোহন বিনা পারিশ্রমিকে কাজে লাগায়। শুধু রমণীমোহন নয়, রাধানাথ যখন অন্নচরণের পাউন্যা নাইয়া হিসেবে কাজ করতে যায়,সেই সময় অন্নচরণও প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করেছে।

'কিন্তু অন্নচরণ সবসময় এ নিয়ম মানে না। জালে মাছ যখন বেশি পড়ে, তখন নিয়মকানুনের ধার ধারে না বহদ্দার।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৩৩)

নিয়ম ভেঙে মাছ ধরার ফলে বহদ্দাররা নৌকা ভর্তি মাছ নিয়ে ফেরে। রাধানাথের মতো পাউন্যা নাইয়ারা ফেরে শূন্য হাতে। এই বঞ্চনা ও শোষণের পরেও রাধানাথরা কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। বহদ্দারদের এই অত্যাচার ও বঞ্চনা তারা মুখ বুজে সহ্য করে। এমন নয় যে তাদের প্রতিবাদের ভাষা জানা নেই, কিন্তু প্রতিবাদ করলে বিপদ নেমে আসে পউন্যাদের ওপর। এ ব্যাপারে জেলে সমাজের বহদ্দাররা এককাট্টা। প্রতিবাদের শাস্তি হিসেবে বহদ্দাররা তাদের গোঁজ পোঁতার সময় বিত্ত দেয় না। আসলে একটি নৌকা দিয়ে গোঁজ পোঁতা যায়না। দুটো নৌকার প্রয়োজন হয়। আর এই সুযোগই নেয় বহদ্দাররা। নৌকা ধার চাইতে গেলে তারা নানা অজুহাতে নৌকা দিতে মানা করে দেয়। পাউন্যা নাইয়াদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এটা বহদ্দারদের চাল- তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই কৌশল। তাই বহদ্দারদের শোষণ বঞ্চনার প্রতিবাদ করলে তাদের অসহযোগিতা সাধারণ জেলেদের জীবনকে জেরবার করে তোলে।

এরকম ঘটনারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায় নিকুঞ্জ বহদ্দারের ক্ষেত্রে। নিকুঞ্জ উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেপাড়ার প্রভাবশালী বহদ্দার এবং পাঁচজন সর্দারের একজন। পরিমল তার নৌকার পাউন্যা নাইয়া। এই পরিমলই বাধ্য হয়ে তার বিরুদ্ধে সালিশ ডাকে। তার অভিযোগ-

'নিকুঞ্জ কাকারে বউত্ বিনয় গইল্লাম গোঁজ গাড়ি দিবাল্লাই। তাঁই কনো পাত্তা নো দিল, হাত-পা ধরি অনুরোধ গইল্লাম, তাঁই নো হুইন্লো। কইলো—সামনর জো যাউক গই। পরে দেখা যাইবো। গত এক জো আঁই জাল বোয়াইত্ নো-পারি। পোয়া-ছা লই হুয়াই মরির। গত রাতিয়া আঁর ঘরত্ চুলা নো—জ্বলে'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৪)

পরিমলকে গোঁজ পুঁততে সাহায্য না করার মধ্যে বঞ্চনার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বহদ্দারের কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে পেটের জ্বালায় পরিমল সাহসের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু নিকুঞ্জের মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই। ক্ষমতা ও অর্থের দম্ভে সে পরিমলের মতো সাধারণ জেলের দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত। তাইতো সে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে–

'পাউন্যা নাইয়া মানে আঁর পইরর মাছ। আঁই যেএন গরি চালাইয়ম হেএন গরি চলিবো। গোঁজ হাঁইয্যে, সময়মতো গাড়ি দিয়ম। আঁল্লাই সালিশ!' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৪)

নিকুঞ্জের এই কথায় রাধানাথ প্রতিবাদ করে বলে,পাউন্যা তার গোলাম নয়, পাউন্যা নাইয়া বহদ্দারের সহকারী। তার সুখ দুঃখে বহদ্দার এগিয়ে আসবে- সেটাই জেলে সমাজের নিয়ম। রাধানাথের কথায় সমবেত জেলেরা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে এবং নিকুঞ্জের অন্যায় বঞ্চনার বিরুদ্ধতা করে। নিকুঞ্জ দশজনের রায় মেনে নিলেও তার সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ে রাধানাথের ওপর। সভার মাঝখানেই নিকুঞ্জ তাই রাধানাথকে হুমকি দেয়,

'রাধানাইথ্যা, তইলে তুই বউত্ কাবিল অই উঠ্যস। লিডার হইয়স। ভালা ভালা। চোখ-কান খোলা রাইস'।

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৫)

অন্যদিকে উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের নামকরা বহদ্দার দয়ালহরি ও তার ভাই রামহরি। দয়ালহরি দয়ালু, মিষ্টভাষী। কিন্তু রামহরি তার বিপরীত। সাধারণ জেলেদের প্রতি তার অগ্রাসী ও কঠোর ব্যবহার রামহরিকে কুখ্যাত করেছে। লক্ষণীয়, কৃষ্ণমিলন ও রূপণ নামক দুজন গাউরের কথা প্রসঙ্গে তাদের প্রতি রামহরির শোষণ ও বঞ্চনার কথা ধরা পড়েছে। জানা যায়, দয়ালহরির নৌকায় গাউর হয়ে কাজ করতে আসার আগে কৃষ্ণমিলন সদ্য বিয়ে করেছে। বিয়ের খরচ সামলানোর জন্য সে দয়ালহরির কাছ থেকে টাকা ধার এবং গাউর খাটার জন্য বায়না নিয়েছিল। বিয়ের পর স্ত্রীকে কিছু সময় দেওয়ার জন্য সমুদ্রে গাউর খাটতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাল্টে বায়নার টাকা দয়ালহরিকে সে ফেরত দিতে চায়, কিন্তু রামহরি কৃষ্ণমিলনকে হুমকি দিয়েছে,

'ভালায়ভালায় নৌকাত্ উঠ গই। নইলে বিপদত্ পরিবি।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৯)

আবার রূপণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার বাবা দয়ালহরির কাছ থেকে গাউর খাটার অগ্রিম বায়না নেয়। কিন্তু হাঁপানি রোগের কারণে সে আসতে পারে না। রামহরি এই নিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল

করেছে। বাবাকে অপমানিত হতে দেখে রূপণ সহ্য করতে পারে না। তাই সে এই অপমানের জবাব দিয়ে বলে-

'গাইল নো দিও, গাইল নো দিও। বাপ নো গেলে আঁই যাইয়ম। এখন যাও। সময় অইলে নৌকাত্ উইঠ্যম'।

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৯)

লক্ষণীয় সমগ্র জেলেপাড়ায় ছবিটি প্রায় একই রকম। বহদ্দারদের ইচ্ছে অনুসারে পাউন্যা ও সাধারণ জেলেদের জীবন চলে। অর্থ ও ক্ষমতার জোরে তারা জেনে বুঝে সাধারণ জেলেদের শোষণ ও বঞ্চনা করে। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পায় না। কারণ তারা জানে প্রতিবাদ করলে তাদের জীবনে অসহযোগিতা ও শাস্তি নেমে আসবে। তাদের এই প্রতিবাদহীনতা বহদ্দার শ্রেণিকে ভিন্ন এক শোষণ-বঞ্চনার সুযোগ করে দেয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় নিম্নবর্গের সমালোচক রণজিৎ গুহের- 'Dominance without Hegemony'-গ্রন্থের কথা। সেখানে তিনি গ্রামশির আধিপত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, আধিপত্য সৃষ্টি না করেও কীভাবে আধিপত্য সৃষ্টি করা হয়। এমনটা বাধ্যতামূলক বা বলা ভালো অবশ্যসম্ভাবী নয় যে প্রতিটি নাগরিক সমাজে আধিপত্য সৃষ্টি করা হবে জনগণের সর্বসম্মতির ওপর ভিত্তি করে। যদিও এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে প্রভুত্ব স্থাপনের বা আধিপত্য কায়েমের জন্য রাস্তাটি হল হেজেমনি তৈরি না করেও বলপ্রয়োগ বা ক্ষমতার জোরে স্বার্থসিদ্ধি করা। এই বিষয়টি রণজিৎ গুহ তাঁর আলোচ্য গ্রন্থে বিশদে আলোচনা করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে ক্ষমতার সাধারণ বিকল্প সম্পর্কে রণজিৎ গুহের বক্তব্য-

'… Dominance (D) and subordination (S). These two terms imply each other: it is not possible to think of D without S and vice versa … As such, they permit us to conceptualize the historical articulation of power in colonial India in all its institutional, model, and discursive aspects as the interaction of these two terms- as D/S in short'

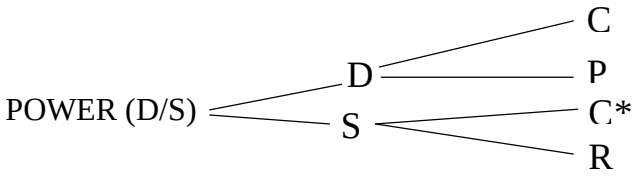

Figure1: General Configuration of Power (Guha 1997, p. 20)

উপরিউক্ত রেখাচিত্র রণজিৎ গুহ 'D' সংকেত দ্বারা Dominant আধিপত্য, 'S' দ্বারা Subordinant অর্থাৎ নিম্নবর্গীয়, 'C' সংকেত দ্বারা Coercion অর্থাৎ বাধ্যকরা বা জবরদস্তি, 'P' দ্বারা Persuasion অর্থাৎ প্ররোচনা, 'c* দ্বারা Collaboration অর্থাৎ সহযোগিতা এবং 'R' দ্বারা Resistant অর্থাৎ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধকে ইঙ্গিত করেছেন। ক্ষমতা শৃঙ্খলার প্রবাহমানতায় ডোমিন্যান্ট শ্রেণি ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে

'C' ও 'P' দ্বারা। অর্থাৎ জোর করা বা জবরদস্তিভাবে বাধ্য করা এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্ররোচনামূলক বার্তা দেওয়া। অন্যদিকে তাদের এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নবর্গের মধ্যে C* অর্থাৎ সহযোগিতা ও শ্রেণি চেতনার সঞ্চার এবং'R' অর্থাৎ প্রতিবাদের ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়। রণজিৎ গুহ উপরিউক্ত বক্তব্যে ব্যাখ্যা করেছে এভাবে-

> '… the relation between the terms of each of the constitutive pairs is not quite the same as that between the terms of the parent pair. D and S imply each other just as do C and P on the one hand, and C* and R on the other. But while D and S imply each other logically and the implication aplies to all cares where an authority structure can be legitimately defined in those terms, the same is not true of the other dyads. … In other words, mutual implication of D and S has a universal validity for all power relations informed by them, whereas that of C and P or of C* and R is true only under given condition.' (Guha 1997, p. 21)

সুতরাং আলোচ্য 'জলপুত্র' ও 'দহনকাল' উপন্যাসে জেলেদের ওপর দাদনদার বা বহদ্দারদের ক্ষমতার শৃঙ্খলা উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডোমিন্যান্ট শ্রেণি 'c' অর্থাৎ জবরদস্তি করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছে। তবে শুধু 'Coercion' দ্বারা নয় 'Persuasion' দ্বারাও আধিপত্যকামীরা নিম্নবর্গকে শোষণ ও বঞ্চনা করেছে। 'দহনকাল' উপন্যাসে দেখি রাধানাথের মা চন্দ্রকলা মাছ বিয়ারির কাজ করে। প্রত্যেকদিন লাভজনক ফল পাওয়া যায় না। হতদরিদ্র জেলেদের দিন আনা দিন খাওয়া জীবন। এর মধ্যে কেউ যদি মাছ নিয়ে নানা অজুহাতে দাম বাকি রেখে যায় তাহলে তাদের বড়ো ক্ষতি হয়ে যায়। এরকমই একদিন-

> 'একজন বয়স্কলোক দুই সের সুন্দরী মাছ কিনে 'বড়ো নোট ভাঙতি নাই, ভাঙাই আনি দির' বলে চলে গেছে। ফিরে আসেনি। জেলেদের রক্ত-জল-করা মাছ কত সহজেই এরা নিয়ে যায়—বউ বাচ্চাদের খাওয়ায়, নিজে খায়! অথচ এই চাতুরির কারণে হতদরিদ্র জেলের যে কত বড়ো ক্ষতি হয়ে যায়—তা ভেবে দেখে না ওরা। জেলেদের গালি দিতে, তাদের গায়ে হাত তুলতে, বিনিপয়সায় মাছ নিয়ে যেতে এরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। তাদের বিবেক তখন বোবা, বয়রা, অন্ধ হয়ে যায়।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৩)

সমাজের উচ্চবর্গের এ ধরনের প্ররোচনায় স্বাভাবিকভাবেই নিম্নবর্গের জেলেরা মাছের দাম থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তাদের উনুনে আগুন জ্বলে না। কারণ ওই মাছের দামই তাদের লভ্যাংশ। বহদ্দারকে মাছের দাম চুকিয়ে দিয়ে তাদের হাতে চাল-ডাল-তেল-নুন কেনার অর্থ থাকে না। চন্দ্রকলার মতোই রাধানাথও আব্দুল খালেক মেম্বারের কাছে বঞ্চিত হয়েছে। দেখা যায়, তিন টাকা মূল্য বেশি দামের একটি ইলিশ মাছ সে তার কাছে বিক্রি করেছিল। কিন্তু খালেক সাহেব রাধানাথকে তিন টাকা ধরিয়ে দিয়ে চলে যায়। রাধানাথ কিছু বলতে পারে না।

'কী কইত্ পারি? মেম্বর রাইতরে দিন গরে। জীবন বাজি রাখা মাছ লেজত্ ধরি সামনে দি লই গেল গই। ...' রাধানাথের ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সেই দীর্ঘশ্বাসে বঞ্চনার বেদনা মিশে আছে'।

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৪)

তবে শুধু যে জেলেদের ওপর এমন বঞ্চনা, তা নয়, উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের অনন্ত দর্জির ক্ষেত্রেও দেখা যায় একই বঞ্চনা। কমলমুন্সির রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাটের দুইদিন অনন্ত দর্জির কাজ। সেই কাজের পর অধিকাংশ মানুষই তাকে মজুরি দেয়, কেউ আবার নানা অজুহাতে টাকা বাকি রেখে যায়। অনন্ত দর্জি জানে-

'... ওই লোক আর কোনোদিন এই দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটবে না, পয়সা দেওয়াতো দূরের কথা। তারপরও মুখে কিছু বলেন না তিনি, ঘাড় কাত করে সম্মতি জানান।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৭)

অন্যদিকে উপন্যাসের খু-উ বুইজ্যা চরিত্রটি মানসিক ভারসাম্যহীন বলে তাকে কাজের বদলে ভাত খাওয়ানোর আশ্বাস দিয়ে কার্যসিদ্ধি করেছে অন্নচরণ বহদ্দার। কিন্তু ভাত খাওয়ার সময় ভাত দেয়নি সে, ক্ষোভে, রাগ, দুঃখে খু-উ-বুইজ্যাকে গালাগাল করতে শোনা গেছে। অসহায়, দরিদ্র, সহায়সম্বলহীন অর্ধপাগল মানুষটির বঞ্চনার ঘটনাটি তার কথাতেই ধরা পড়েছে-

'মাছ বাছনর আগে কইয়ে—বাছ বাছ, মাছ বাছ—ভাত দিয়ম, পেট পুরাই ভাত দিয়ম। মাছ বাছি শেষ গরনর পরে কঅদ্দে—কালিয়া খাইস, কালিয়া খাইস, এখন যা'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ৩৫)

খু-উ-বুইজ্যার একজন অসহায় মানুষের প্রতি এ ধরনের আচরণ অমানবিক শোষণ ও বঞ্চনাকে নির্দেশ করেছে।

বঞ্চনার একই ঘটনা দেখা যায় 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে শিবশঙ্করের বন্ধু প্রিয়রঞ্জনের বাবার ক্ষেত্রে। প্রিয়রঞ্জনের বাবা সুরঞ্জন পেশায় নাপিত। পুজো ও ঈদের মরসুম বাদে তাঁর দোকানে তেমন কাস্টমারের আসা-যাওয়া নেই। যাও বা দু-একজন আসে, তারাও বাকির খাতায় ক্ষৌরকর্ম করিয়ে যায়। টাকা চাইলে বলে,

'অ সুরঞ্জন, টাকা আনতে ভুলে গেছি। পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে চলে এসেছি। আজকে আবার জুম্মার দিন। তাড়াতাড়ি মসজিদে যেতে হবে। এখন যাই। পরে নিস টাকা।' (জলদাস ২০১৯, পৃ. ৭৭)

আলোচ্য উপন্যাসে এরকমই একজন হলেন জব্বার মৃধা। সুরঞ্জন তাকে বহুবার টাকার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার পরও তার কাছে টাকা থাকে না। তার দুই ছেলের একজন থাকে আমেরিকায় এবং অন্যজন বিদেশি জাহাজে চাকরি করে। ছেলেদের পাঠান টাকায় জমি কেনে সে। কিন্তু সুরঞ্জনের মতো দরিদ্র নাপিতের চুল কাটার পারিশ্রমিক দেওয়ার টাকা তার কাছে থাকে না। আসলে জব্বারের মতো মানুষেরা

সমাজের তথাকথিত মানুষদের পরিশ্রমের মূল্য শোধ করার প্রয়োজন মনে করে না। তারা ভাবে এদের কাজই হল সমাজের উচ্চশ্রেণির সেবা করা। সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণিকে অধীনস্ত ভেবে জব্বাররা এভাবেই আধিপত্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং তাদের বঞ্চনা করার সাহস অর্জন করে।

অন্যদিকে 'অর্ক' উপন্যাসে দেখা যায়, তিন মাইল পথ রহমালির রিকশায় এসে মাত্র পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক দেয় ছোবান মেম্বার। রহমালি সাত টাকা দাবি করলে ছোবান তাকে রাস্তার ওপর ফেলে জুতো দিয়ে বেধড়ক পেটায়।

> 'হয়রান না হওয়া পর্যন্ত রহমালিকে পিটিয়ে গেলেন ছোবান মেম্বার। আশেপাশের লোকেরা নির্বাক দর্শক হয়ে থাকল। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস করল না।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১০৯)

এইভাবে দিনের পর দিন সমাজের তথাকথিত নিচুতলার মানুষ মার খেয়ে মার সহ্য করে এসেছে। তাদের প্রতিবাদহীনতাই উচ্চবর্গের সবচেয়ে বড়ো শক্তি।

৪.১.২.৩ ষড়যন্ত্রমূলক আর্থিক শোষণ ও বঞ্চনা

জেলেসমাজে বহদ্দার তথা সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী মানুষেরা তাদের অধস্তনে থাকা মানুষগুলোর উপর অন্যায় বঞ্চনা ও শোষণ করেছেন। কিন্তু বহদ্দাররা ক্ষেত্রবিশেষে অন্য এক প্রভু গোষ্ঠীর কাছে শোষিত ও বঞ্চিত হয়েছে। 'দহনকাল' উপন্যাসে কৈবর্তপাড়ার জালাল মেম্বার রামহরির সঙ্গে কালিদইজ্যার ভাগীদারি ব্যবসায় নামে। এর পেছনে রয়েছে মেম্বারের অন্য উদ্দেশ্য। জালালের সাকরেত সুদীপের বুদ্ধিতে সে এই ব্যবসায় নেমেছে। সুদীপের কথায়,

> 'মেম্বার সাব, রামহরির লগে কালিদইজ্যার নৌকা গরন। রামহরি জাইল্যা, মাথা মোটা। আখেরে আওনর লাভ অইবো। কাসেইম্যারে টাইট দি রামহরির উপকার গইয্যন। আওনেরে ফিরানোর সাহস গইত্যো নো রামহরি'।
>
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ১০১)

লক্ষণীয় জালাল মেম্বার ব্যবসায় নেমেছে প্রথম থেকে নেতিবাচক ও বঞ্চনার উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই সে সুযোগ বুঝে রামহরিকে হুমকি দিয়ে আদায় করার মানসিকতা পোষণ করেছে। উপন্যাসে দেখি, হঠাৎ একদিন জালাল মেম্বার রামহরিকেকে জানিয়েছে, আসছে বছর নৌকায় কিছু মুসলমান গাউর রাখতে হবে। মেম্বারের কথা শুনে রামহরি জানায়, মুসলমান গাউর গভীর সমুদ্রে কাজ করতে পারবে না। গভীর সমুদ্রের কাজ সোজা নয়। কিন্তু মেম্বার ধমকের সুরে জানায়, সোজা-কঠিন সে বুঝে নেবে। তার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। প্রথম বছর প্রাপ্যের চেয়ে বেশি মাছ নিয়ে যাওয়ার পর মেম্বারের অভিসন্ধি টের পেয়ে যায় দয়ালহরি। পরবর্তীকালে শেয়ারের টাকা ফেরত দিতে চাইলেন মেম্বার তা নিতে মানা করলে

দয়ালহরির কাছে মেম্বারের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। আব্দুল হক রামহরিকে হুমকি দেয়, মেম্বারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে যেন কোনো কথা না বলে। রামহরি বুঝতে পারে জালালের ইচ্ছা মানে আদেশ। সে যা ইচ্ছা প্রকাশ করবে তা রামহরিকে মানতে হবে। মাছ মারার মরসুমে রামহরি মেম্বারের কাছে শুঁটকির ভাগ চাইতে গেলে নানা অছিলায় ভাগ দিতে অস্বীকার করে সে। বরং উল্টে সে রামহরির কাছে হিসেবের গরমিল করে আরো টাকা দাবি করে। নির্বিকার জালাল মেম্বার বলে-

'তোঁয়াত্তোন মনত্ আছে কিনা নো জানি। টিঁয়া দিবার সমত্ কইলাম দে আঁই লাভের মালিক, লোকসানর নয়'।

(জলদাস ২০১০, পৃ. ১২৭)

জালালের কথা শুনে রামহরি হতভাগ ও স্তম্ভিত। অশিক্ষিত রামহরি সরল বিশ্বাসে মেম্বারের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল, কতটাকা নিয়ে কত টাকা লিখে রেখেছে মেম্বার, তাও সে জানে না। মেম্বারের এত বড়ো অন্যায়ের পরও সে জানায়, রামহরির কাছ থেকে বাকি টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত তার জমি মেম্বারের কাছে বন্ধক থাকবে। শুধু তাই নয়, রামহরি আজ থেকে মেম্বারের কালিদইজ্যার নৌকায় বড়োমাঝি হিসেবে কাজ করবে। লক্ষণীয় রামহরির সরলতার সুযোগ নিয়ে জালাল তাকে নিঃস্ব করেছে। এবং এই অন্যায়ের উপশম হিসেবে নিজেই তার নৌকায় রামহরিকে বড়োমাঝি নিযুক্ত করে উদারতাকে প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, জালাল মেম্বার ক্ষমতার একপ্রান্ত 'D' অর্থাৎ ডোমিন্যান্ট শ্রেণির প্রতিভূ। রামহরিকে শোষণের ক্ষেত্রে সে কখনোই 'C' (Coercion) অর্থাৎ জবরদস্তির আশ্রয় নেয়নি বরং 'P' (Persuasion) অর্থাৎ প্ররোচনার আশ্রয় নিয়েছে। যেমন-

ক. রামহরির সঙ্গে কালিদইজ্যার ব্যবসায় অংশীদারী হিসেবে লোভনীয় প্রস্তাব পেশ জালালের।

খ. সমান অংশীদারের নামে যা প্রাপ্য তার চেয়ে বেশি অংশ হস্তগত করা।

গ. হিন্দু গাউরদের বদলে মুসলমান গাউর রাখা।

ঘ. রামহরি নৌকা ভর্তি শুঁটকির ভাগ দাবি করলে, নানা আছিলায় জালালের অস্বীকার করা।

ঙ. ভাগ থেকে বঞ্চিত করে উল্টে রামহরির কাছ থেকে টাকা বাকি থাকার দাবি।

চ. বাকি টাকা আদায় পর্যন্ত রামহরির জমি দখল জালালের।

ছ. রামহরির নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে কাগজে টিপ সই করানো, ৩৫ হাজার টাকা ঋণ, লাভের মালিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা এবং টাকা শোধ দিতে না পারলে নৌকার মালিকানা ভোগের মতো ষড়যন্ত্র করে রামহরির সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া।

জালাল মেম্বার রামহরির প্রতি একই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও শোষণ-বঞ্চনা করেছে। এসব অন্যায়ের পরেও যখন জালাল মেম্বার রামহরিকে তারই নৌকার বড়োমাঝি হিসেবে নিযুক্ত করেছে, তখন রামহরির অস্তিত্বে আঘাত লেগেছে। সে গ্রামের গণ্যমান্য লোকের কাছে সাহায্য চেয়েও পায়নি।

অন্যদিকে 'অর্ক' উপন্যাসে ছোবান মেম্বার জেলেপাড়ার একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। সবরকম সরকারি সাহায্য তার মারফত জেলেদের কাছে পৌঁছয়। এই কর্মক্ষমতাকেই তিনি শোষণযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। উপন্যাসে জানা যায়, ছোবান মেম্বার কোনো জেলেকে মাছ নিয়ে মাছের দাম দেন না। দাম চাইলে বলে-

> '...সরকারি রিলিফ যখন আসে ওগুলো মক্ত-আলা দিই না তোদের? ওই রিলিফর দাম নিই আমি তোদের কাছ থেকে বেটারা? এর পর মা-বোন তুলে দুইচারটা গালি দেন।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১৪-১৫)

অশিক্ষিত সরল জেলেরা বোঝে না, সরকারি রিলিফ সকলকে সমানভাবে বন্টন করে দেওয়া ছোবানের কর্তব্য ও দায়িত্ব। জেলেদের এই অবুঝ মানসিকতার সুযোগ নেয় ছোবান। তাইতো বলরাম যখন ভারতে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল, তখন তার বসত ভিটা ছোবানের কাছে বিক্রি করার কথা বলেছিল সে। কিন্তু সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে ছোবান মেম্বার অসন্তুষ্ট হয়েছে। বলরামের বাড়ি কেনার ইচ্ছে পূরণ না হলেও সুযোগ বুঝে বলরামকে তার পুকুরটি পাঁচ বছরের জন্য লিজ দিতে বাধ্য করে ছোবান মেম্বার। শর্ত থাকে প্রতিবছর হাজার টাকা এবং মাঝেমধ্যে খাওয়ার জন্য মাছ দেবে সে।

> 'কিন্তু এমন কণ্ঠ আর এমন চোখে বললেন, না দিলে সমূহ ক্ষতি করবেন বলরামের। ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেদিন ছোবান মেম্বারকে পুকুরটা লিজ দিতে রাজি হয়েছিল বলরাম।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৭৯-৮০)

কিন্তু দেখা গেল, বছর বছর মাছ চাষ করলেও লিজ নেওয়ার শর্ত পূরণ করে না মেম্বার। নানা অজুহাতে মাছ দেয় না সে। প্রতি বছর হাজার টাকা চুক্তিরও একই অবস্থা। মাঝেমধ্যে দশ বিশ পঞ্চাশ একশ টাকা করে দেয়। বলরামের আস্থা অর্জনের জন্য মেম্বার হিসেবের খাতা বের করে দেখান। কিন্তু সেই হিসেবের খাতা গরমিলে পূর্ণ। দশের জায়গায় বিশ, বিশের স্থানে পঞ্চাশ, পঞ্চাশের স্থানে একশ টাকা লিখে রাখেন ছোবান।

৪.১.২.৪ অন্যান্য প্ররোচনামূলক আর্থিক শোষণ

এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম, ক্ষমতার শৃঙ্খলায় আধিপত্য যেভাবে গঠিত হয়েছে, সেখানে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কখনো বাধ্য করে, কখনো অর্থের ক্ষমতার জোরে নিম্নবর্গকে বঞ্চনা ও শোষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে

সমালোচক অশোক সেন পুঁজিবাদী ও শ্রমিক সম্পর্কের রেশ টেনে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ হিসেবে আত্মীয়তা, ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি অর্থনৈতিক দিকটিকে প্রভাবিত করে। ফলে উচ্চবর্গ আর্থিক দিক থেকে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গকে চাপে ফেলতে সক্ষম হয়। অশোক সেনের বক্তব্য অনুযায়ী,

> 'The commodity economy enfulgs all relation in a manner that rules out the need for other unifying parameters like kinship, religion, or polities. The capital Labour relation in an independent constitutive element, and commodities in circulation provide the social linkages : One might say that the market replaces the pre- capitalist community.' (Guha (ed.) 1987, p. 211-212)

সমালোচক অশোক সেনের মন্তব্য অনুযায়ী, পুঁজিবাদী ও শ্রমের সম্পর্ক একটি স্বাধীন গঠনমূলক উপাদান এবং প্রচলিত পণ্য সেই সম্পর্কের সামাজিক যোগসূত্র প্রদান করে। অর্থাৎ আধিপত্যকামীরা যে অর্থে শোষণ ও বঞ্চনা করে সেটিও একটি সামাজিক সম্পর্কের অন্তর্গত।

আমরা লক্ষ করি নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেও এই মূলধন ও শ্রমের সম্পর্কটি স্বাধীন গঠনমূলক উপাদান হিসেবে উঠে এসেছে। 'কসবি' উপন্যাসে দেখি জেলেপাড়ার কৃষ্ণা অর্থনৈতিক দুরবস্থার চাপে তপন নামক এক ফল বিক্রেতার জালে জড়িয়ে পড়ে। সে কৃষ্ণাকে আর্থিকভাবে সাহায্য করার বদলে তার দৈহিক ভোগের সুযোগ নেয়। একটা সময় সুযোগ বুঝে তপন কৃষ্ণাকে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিতে বিক্রি করে। পতিতাপল্লিতে কোনো পতিতার প্রথম দৈহিক ভোগের মূল্য অনেক। আমরা লক্ষ করেছি, কালু সর্দার কৃষ্ণাকে কিনে নেওয়ার পর তার সঙ্গে প্রথম মিলনের জন্য ধনী কাস্টমার খোঁজে। কাস্টমার ধরে আনার দায়িত্ব সে জালাল নামক দালালকে দেয়। সে একজন কাস্টমারের খোঁজ আনে। কিন্তু কাস্টমারটি কুশ্রী। মোটা, কালো, বা চোখ নষ্ট ও মুখে বসন্তের দাগ। তাই জালাল ইতস্তত বোধ করে এই বলে যে, নতুন মেয়ে এরকম ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম সম্ভোগে ভয় বা আতঙ্কিত হতে পারে। কিন্তু কালু সর্দার কোনো কথার তোয়াক্কা করে না। তার মতে, নতুন মেয়ে ঘরে তিন দিন ধরে বসে আছে এবং তার প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। তার বক্তব্য-

> 'এ-ন গরি কত্তদ্দে যেএন তোর মাইয়ার ঘরত্ পইল্যা বেডা গল্লাওর। আঁত্তোন টিঁয়ার দরকার। বউত্ টিঁয়া। টিয়া সুন্দর অইলে হইল, বেডা সুন্দরর দরকার নাই'। (জলদাস ২০১১, পৃ. ৬৪)

আসলে কালু সর্দার এখানে পুঁজির পূজারী। সে শুধুই টাকা চেনে। টাকা কীভাবে, কোন পথে তার হাতে আসবে—এটাই তার মূল লক্ষ্য। প্রয়োজনে সে খুন পর্যন্ত করতে প্রস্তুত। কৃষ্ণা তো সামান্য পতিতা। ফলে দেখা যায়, যাদের ঘিরে কালুর ব্যবসা তাদের প্রতি সে সবচেয়ে কঠোর ও নির্দয়। টাকার জন্য পতিতাদের

প্রতিনিয়তই এভাবেই শোষিত হতে হয় সমাজের সর্দার-মাসি-মস্তানদের হাতে। তাইতো মোহিনী মাসির সন্তান কৈলাসের মনে প্রশ্ন জেগেছে,

> 'মা, তুমি বল—এই অসহায় মেয়েদের জন্য কে আছে? তোমরা তাদের শুধু শোষণ করে যাচ্ছ, তাদের ভালোর জন্য কী করছ তোমরা?' (জলদাস ২০১১, পৃ. ১৫৩)

মায়ের কাছে এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পায় না কৈলাস। তাই সে পতিতাদের জন্য হিতকর কিছু কাজ করতে চায়। সে পতিতাদের একত্র করে তাদের অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতন করে বলে, সর্দার-মাসিরা কীভাবে প্রতিনিয়ত টাকার জন্য তাদের শোষণ করে চলছে। তাই কৈলাস তাদের পরামর্শ দেয় সপ্তাহে একদিন দেহ ব্যবসা বন্ধ করে উপার্জনের ৮০ শতাংশ নিজের কাছে রেখে মাসি সর্দারের হাতে ২০ শতাংশ দিতে। কারণ এ ব্যবসা পতিতা নির্ভর। তাই তাদের অধিকার আছে শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার ও উপার্জনের অধিকাংশ নিজের কাছে রাখার। পতিতারাও কৈলাসের কথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারে। তাই ইলোরা ও বনানী সিদ্ধান্ত নেয় সপ্তাহে একদিন তারা ঘরে কাস্টমার তুলবে না। পতিতাদের এই সিদ্ধান্তে কালু সর্দার বেজায় চটে যায়। দলবল নিয়ে কালু পশ্চিমগলিতে পৌঁছায় এবং বনানীকে সামনে পেয়ে তার গালে চড় মারে।

> 'চোদমারানি বেহেনচোদ, দশ টেইক্যা সস্তা খানকি, তুই চাইতাছস ছুটি—সাপ্তাহিক ছুটি? মাগি, বড়ো অফিসের অফিসার হইছস, ভদার বিশ্রামর লাইগ্যা ছুটি চাস'? (জলদাস ২০১১, পৃ. ১৫২)

আমরা জানি, ক্ষমতা যেখানে সৃষ্টি হয়, সেখানে তাকে ঘিরেই সুবিধাবাদী, লোভী, স্বার্থপর, লোকেদের ভীড় জমে ওঠে। কালু পতিতাপল্লির সর্দার। তার হাতে সমাজ পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে। দেহব্যবসাকে শক্ত হাতে সামাল দেওয়ার জন্য তাই সে শক্তিবাহিনী গঠন করেছে। সেই গুন্ডা মস্তানদের দলে রয়েছে সেই পতিতাপল্লির জারজ সন্তানরা। ক্ষমতা, শক্তি ও অর্থবলের দ্বারা কালু সর্দার পতিতাপল্লির একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠেছে। ক্ষমতা ও অর্থের ভিত্তিতে পতিতাপল্লিতে সর্দার-মাসি-মস্তান-পতিতাদের মধ্যে যে শ্রেণিবিভাজন সৃষ্টি হয়েছে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই অর্থ ও ক্ষমতার সঙ্গে শ্রমের একধরনের শোষক-শোষিতের সম্পর্ক প্রদর্শিত হয়েছে।

'রামগোলাম' উপন্যাসটি মেথর সম্প্রদায়কে নিয়ে রচিত হলেও আংশিকভাবে জেলে সমাজের কথা উঠে এসেছে, যেখানে অর্থনৈতিক শোষণের বর্ণনা আমরা পেয়েছি। সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ তথা নিম্নবর্গের অন্যতর শ্রেণি হল মেথর সম্প্রদায়। উপন্যাসে জানা যায়, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের তৎকালীন পূর্ববঙ্গে মেথর সম্প্রদায়কে আনা হয়েছিল কানপুর, এলাহাবাদ, চরগাও প্রভৃতি এলাকা থেকে। ব্রিটিশ যুগে তাদের চাকরির নিশ্চয়তা ছিল। পরিশ্রম অনুযায়ী সম্মানজনক পারিশ্রমিক ছিল। কিন্তু দেশভাগ

পরবর্তীকালে মেথর সম্প্রদায়ের নিশ্চয়তার ভাঙন দেখা দেয়। স্বাধীনতার পর তাদের অর্থনৈতিক জীবনের ভাঙ্গন প্রায় নিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তাদের বলা হয়—চাকরির মেয়াদ শেষ হলে সরকার প্রদত্ত ঘরবাড়ি, কলোনি ও সমস্ত সুযোগ সুবিধা ছাড়তে হবে। তাছাড়া মেথরদের জন্য বরাদ্দ রেশন প্রথাও একটা সময় বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, কর্পোরেশন থেকে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষদের জন্য ঝাড়ুদারের চাকরি উন্মুক্ত করার উদ্যোগ নিলে ধীরে ধীরে উন্মূল হতে থাকে চট্টগ্রামের মেথর সম্প্রদায়। আসলে যে চাকরি কেবলমাত্র মেথরদের জন্য নিশ্চিত ছিল, সেখানে সমাজের অন্যান্য মানুষদের মধ্যে সেই চাকরি উন্মুক্ত করে দেওয়ার অর্থ মেথর সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার দিকে ঠেলে দেওয়া। তাইতো কর্পোরেশনের এই উদ্যোগের কথা শুনে চারটি মেথরপট্টির মেথররা ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টির মন্দিরে একত্রিত হয়। বান্ডেলের মুখ্য চেদিলাল সর্দার গুরুচরণের কাছে হাহাকার করে ওঠে এই বলে যে,

> 'বল সর্দার, এবার আমাদের কী হবে? করপোরেশন বলেছে—এ চাকরি শুধু আমাদের হয়ে থাকবে না। হিন্দু-মুসলমান সবাই এই চাকরির সুযোগ পাবে। ওরা যদি দলে দলে আমাদের চাকরিতে ঢোকে, তাহলে আমরা যাব কোথায়?'
>
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ৩২)

মেথেররা সমাজের তথাকথিত মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন এক অন্ত্যজ সম্প্রদায়। কর্পোরেশনের এই সিদ্ধান্ত তাদের অসহায়তার চরমসীমায় পৌঁছে দিয়েছে। অসহায়তা মেথরদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগিয়ে তুলেছে এবং তারা প্রতিবাদের রাস্তা বেছে নিয়েছে। রামগোলাম এই প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু করপোরেশনের বড়োবাবু আব্দুস ছালামের ক্ষমতার কাছে প্রতিবাদ টিকতে পারেনি। যোগেশকে হত্যা করার মিথ্যে অপরাধী সাজিয়ে রামগোলাম ও কার্তিককে আইনসম্মতভাবে দমন করেছে আব্দুস ছালাম। রামগোলাম ও কার্তিক পুলিশের কাছে গ্রেপ্তার হলে আবদুস ছালামের কাছে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকার পথ মসৃণ হয়েছে। ফলে দেখা যায়, তিনি অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে সুইপার নিয়োগ করলেন। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কিছু মেথরদেরকে বেছে বেছে চাকরিচ্যুত করার পাশাপাশি আইন করলেন—হরিজনদের মধ্যে থেকে কেউ কোনোদিন জমাদার হতে পারবে না। এখন থেকে বাংলাদেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষেরা সুইপারের চাকরি পাওয়ার অধিকার পাবে। এই নিয়ম বলবৎ করার ফলস্বরূপ দেখা গেল –

> '...ভিন্ন সম্প্রদায়ের সুইপাররা চাকরি এবং ঘর ভাড়া দিল।... চাকরির খাতায় তাদের নাম থাকল। চাকরি করতে লাগল বেকার হরিজনরা। বিনিময়ে অর্ধেক বেতন। অন্য অর্ধেক বেতন চাকরি না করা ভিন্ন সম্প্রদায়ের সুইপারদের। তাদের নামে অনুমোদিত কলোনির ঘর তারা ভাড়া দিল হরিজনদের'। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৯১-১৯২)

অর্থাৎ হরিজনরা যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই থেকে গেল। সমাজের মানুষের নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করে মেথর সম্প্রদায় নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইলেও উচ্চবর্গের আধিপত্যকামীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্বলকে আরো দুর্বল, দরিদ্রকে আরো দরিদ্র এবং অসহায়কে আরো বেশি অসহায়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

'রামগোলাম' উপন্যাস সর্দার গুরুচরণের মৃত্যুর পর তার দেহ দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর জানা যায় মেথরদের মতো অস্পৃশ্য শ্রেণির মরা পোড়ানোর জায়গা অন্যত্র করা হয়েছে। তার উপর দাহকার্যের জন্য শ্মশান কমিটি মেথর সম্প্রদায়ের থেকে মরা পিছু আড়াই'শ টাকা ধার্য করার নির্দেশ দিয়েছে। রামদাস ডোম তাদের আদেশ শিরোধার্য করে বলে-

> 'তোরা মেথর আছিস। তোদের জায়গা এতা নয়। এইটা বাবুদের জন্য। তোরা পোড়াবি ওইখানে। আর হ্যাঁ, মরা পড়ানোর জন্য ট্যাক্স দিতে হোবে, আড়াই শো টাকা'। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১১০)

বোঝাই যাচ্ছে সমাজ কাঠামোর তথাকথিত নিচুতলার মানুষগুলিকে সমাজের ক্ষমতাধররা নানা কারণ দেখিয়ে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করেছে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে মেথর সম্প্রদায়কে বাধা দিয়েছে উচ্চবর্গ পোষিত একজন তথাকথিত অন্ত্যজ নিম্নবর্গই। কারণ সেই নিম্নবর্গের মানুষটি উচ্চবর্গ দ্বারা লালিত। আনুগত্যের বশে সে চাইলেও তাদের বিরোধিতা করতে পারে না। যেমনটি ঘটেছে রামদাস ডোমের ক্ষেত্রে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, ক্ষমতা সূচক সব সম্পর্কই আসলে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের বৈপরীত্যমূলক কেন্দ্রীয় ধারণা যা শ্রেণি বা জাতি সম্পর্ক, শাসক-শোষিতের সম্পর্ক ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক থেকে পৃথক হয়েও সেই বৈপরীত্যমূলক ধারণার অন্তর্গত। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রায় সকল অভিব্যক্তিই, এই বাইনারি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে স্পষ্টতা লাভ করে। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৩৪)

হরিশংকর জলদাসের উপন্যাসে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজে যেভাবে অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রটি ফুটে উঠেছে সেভাবে তার গল্পগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণের দিকটি ফুটে ওঠেনি। আসলে আমরা জানি উপন্যাসে জীবন ও সমাজকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে যা গল্পের ক্ষেত্রে নেই। 'ঢেন্ডেরি' গল্পে দেখি রাইগোপালের বাবা যদুনাথ জলদাস নৌকা মেরামতের জন্য ছালাম দাদনদারের কাছ থেকে বাধ্য হয়ে দাদন নিয়েছিল। যদুনাথ সেই টাকা সুদে-আসলে শোধ করার পরেও ছালাম তা অস্বীকার করে। তার মতে সে আরো টাকা পায়। যদুনাথ এর প্রতিবাদ করলে ছালাম তার গুন্ডাদের দিয়ে যদুনাথকে ও রাইগোপালকে আঘাত করে। ছালাম যদুনাথকে হুমকি দেয়-

'দুই দিনের মইধ্যে আঁর টিঁয়া নো পৌঁছাইলে যেই পথ দি তোর মার পেডাত্তোন বাইর হইয়স হেই পথদি তোরে গল্লাই দিয়ম চোদানির পোয়া'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৪৭)

বাহুবলের ক্ষমতা হোক বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা হোক—তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে সমান ক্ষমতা প্রদর্শন না করলে দুর্বল অসহায়কে শোষিত হতেই হয়। যেমনটি হয়েছে যদুনাথের সঙ্গে। কারণ ছালামের অর্থবল, বাহুবল দুই-ই আছে। যদুনাথের তার কোনোটিই নেই। তাই যদুনাথের মতো নিম্নবর্গের মানুষদের মার খেয়ে মার সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাই সে বাধ্য হয়ে নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে উত্তর পতেঙ্গা গ্রামে চলে আসে সপরিবারে।

অন্যদিকে 'দুলারী এবং কয়েকজন' গল্পে দেখি মহেশখালীর এক অসহায় জেলে কন্যা উপার্জনের আশায় চট্টগ্রাম শহরে কোনো একটি গার্মেন্টসে চাকরি নিয়েছিল। সেখানে ঘটনাক্রমে শ্যামল দত্ত নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। একটা সময় দুলারীকে বিয়ে করে শ্যামল, তাদের সন্তান হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুলারী একদিন জানতে পারে, শ্যামল আগে থেকেই বিবাহিত। দুলারীর উপার্জনের টাকায় বিনা শ্রমে খাওয়া-পরা চালানোর জন্য সে তাকে বিয়ে করে, এটা তার চালবাজি। সত্য প্রকাশ্যে এলে তাদের দুজনের মধ্যে বচসা সৃষ্টি হয়। দুলারীর মুখে শোনা যায় তার প্রতি শ্যামলের অর্থনৈতিক শোষণের কথা।–

'শুয়োরের বাইচ্চা শ্যামইল্যা! আমার খাইয়া, আমার লগে ফুইত্যা, গায়ে বাতাইস লাগাইয়া কাটাইছস এতদিন। এখন আমার ঘর থেইক্যা বাইর অইয়া যা খানকির পোলা'। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৯৪)

আমরা নিম্নবর্গের ইতিহাসে জেনেছি উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ দ্ব্যণুক সম্পর্কের মধ্যে দুটি চেতনার স্বাতন্ত্র্য যেমন সত্য, তেমনি উচ্চবর্গের প্রভুত্ব ও নিম্নবর্গের অধীনতাও সমান সত্য। অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় চেতনা স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে এই দ্ব্যণুক সম্পর্কের দ্বান্দ্বিক রূপটি সবসময় সচল, কারণ উচ্চবর্গের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে তারা ক্ষমতাকে বিভিন্ন রূপে (যেমন- আধিপত্য, বলপ্রয়োগ, ষড়যন্ত্র) ব্যবহার করে। ফলে অধিকাংশ সময়ই ক্ষমতার কাছে নিম্নবর্গকে ঝুঁকতে হয়। এক্ষেত্রে নিম্নবর্গকে দেখা যায়, নিষ্ক্রিয়, ভীরু ও অনুগত হিসেবে। সুতরাং নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের শোষণ-শাসন প্রক্রিয়া চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা উচ্চবর্গের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা না করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর 'A small History of Subaltern Studies'-প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নিরিখে ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতার আয়োজন করার প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন-

'The arrangement of power in which the present and other Subaltern classes found themselves in colonial India contained two very different logics of hierarchy and opression. One was the logic of the quasi-liberal legal and institutional teamwork which the British introduced into the country.

> Imprecated with this was based on direct and explicit domination and Subordination of the less powerful through both ideological-symbolic means and physical force. The semiotics of domination and subordination were what the subaltern classes sought to destroy every time they rose up in rebellion. (Schwarz (eds.) 2005, p. 474)

অর্থাৎ ঔপনেবেশিক ভারতবর্ষে ক্ষমতার ব্যবস্থা কৃষক ও অন্যান্য নিম্নবর্গের মধ্যে শ্রেণিবিভাজন ও নিপীড়ন এই দুটি ভিন্ন যুক্তিতে দাঁড়িয়েছিল। এর মধ্যে একটি ছিল আধা- উদারবাদী আইনি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যুক্তি যা ব্রিটিশরা এদেশে এনেছিল। এর সঙ্গে জড়িত ছিল আরেকটি সম্পর্ক যেখানে শ্রেণিবিন্যাস প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে আধিপত্যের উপর ভিত্তি করে ছিল। মতাদর্শগত প্রতীকীর মাধ্যমেই কম শক্তিশালীদের অধীনতা এবং আধিপত্যকামীদের শারীরিক শক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। এর ফলে নিম্নবর্গ যতবার বিদ্রোহে জেগে উঠেছে ততবার তাদের ধ্বংস করা হয়েছে। সুতরাং স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা নিম্নবর্গের মধ্যে যে শ্রেণিবিভাজন ও নিপীড়নের মানদণ্ডে শাসনকার্য চালিয়েছিল তার মৌলিকতা নানারূপ ভেদে বর্তমানেও রয়ে গিয়েছে। হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গীয় সমাজে অর্থনৈতিক শোষণের নানা রূপকল্প সে কথাই প্রমাণ করেছে।

৪.১.৩ রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক শোষণ-বঞ্চনা

পুঁজিতন্ত্রের প্রাক্‌পর্বের অন্য যে কোনো সমাজের মতো নিম্নবর্গীয় সমাজেও অর্থনীতি কেন্দ্রিক প্রায় সব সম্পর্কই ক্ষমতার সম্পর্ক বা বলা ভালো রাজনৈতিক সম্পর্ক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। নিম্নবর্গ-চর্চা আসলে উচ্চবর্গের রাজনীতি ও নিম্নবর্গের রাজনীতি-এই স্বতন্ত্র দুটি ধারার আলোচ্য বিষয়। সেই কারণেই ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহ প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কটিকে রাজনীতির মর্মস্থলে রেখেছেন। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৩৪) যে কোনো ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমানার বাসিন্দা। সেই রাষ্ট্র আরোপিত বিবিধ আইন-নিয়ম-বিধি ব্যক্তি-সমাজকে মেনে চলতে হয়। সেক্ষেত্রে এক শ্রেণি নিয়মের স্রষ্টা এবং অপর শ্রেণি সেই নিয়মের পালক। গ্রামশির মন্তব্যেও আমরা লক্ষ করেছি যে, সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্র দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন বিধি-আইন আরোপিত হলেও তাদের মূল উদ্দেশ্য স্বার্থসিদ্ধি করা। রাজনীতির আড়ালে ও বুদ্ধিজীবী সিভিল সোসাইটিকে কাজে লাগিয়ে তারা রাষ্ট্রের জনগণের কাছে শাসনের মাধ্যমে সর্বসম্মতি আদায় করে নেয়। (Hoare (eds.) 1971, p. xiii-xiv) এই শাসন প্রক্রিয়া যে সবসময় সমান শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলে এমনটা নয়, আসলে রাষ্ট্র যে আইন-বিধি আরোপ করে তা সমাজ কাঠামোর মধ্যমবর্গ অর্থাৎ শাসক সহায়ক গোষ্ঠী দ্বারা চালিত হয়। সুতরাং জনগণের আপাত মঙ্গলার্থে যে বিধি

আইন তা সবসময় মান্য করে না তারা। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কটি প্রকট হয়ে ওঠে।

সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের সময় থেকেই প্রভুত্ব ও অধীনতার বৈপরীত্য এক শ্রেণিকে শোষক ও অন্য শ্রেণিকে শোষিতে পরিণত করেছে। হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাসাহিত্যে যে সমাজকে তুলে এনেছেন সেখানে কিছুটা অংশ জুড়ে **১৯৭১** কালপর্বের বাংলাদেশ তথা পূর্ব-পাকিস্তানের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবে তাঁর কয়েকটি গল্প-উপন্যাস যথা 'দহনকাল', 'অর্ক', 'দইজ্যা বুইজ্যা', 'থুতু', 'সীমানা ছাড়ায়ে', 'আহব ইদানীং'-এ মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ও প্রসঙ্গ এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে তৎকালীন বাংলাদেশের জনজীবন বিশেষ করে জেলেসমাজ যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তা আসলে রাজনৈতিক অস্থিরতার এক অন্ধকার পরিস্থিতি। সাম্প্রদায়িকতার জেরে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় কেউ দেশ ত্যাগ করেছে, কেউ সেখানে থেকেই নির্বিচারে পাকসৈন্যের হাতে মৃত্যু বরণ করেছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে রাজনৈতিক কারণে নিম্নবর্গীয় সমাজের শোষণ ও বঞ্চনার প্রকৃতিকে আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

৪.১.৩.১ মুক্তিযুদ্ধ ও নিম্নবর্গের জীবন-যন্ত্রণা

'দহনকাল' উপন্যাসটি জেলেসমাজের কাহিনি হলেও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়াকে কীভাবে বিধ্বস্ত করেছে তার বর্ণনা পাই। মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক অস্থিরতা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে দিয়ে। উপন্যাসে জানা যায়-

> '...১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাত। বাংলাদেশে গণহত্যা জ্বালাবার জন্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চের নিকষকালো রাত্রিটিকে বেছে নিয়েছিল। কমসে কম ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করবার জন্যে আদেশ দিয়েছিল সে। সে-রাতে একটি জাতিকে ধ্বংস করার প্রথম প্রক্রিয়া শুরু করেছিল পাকিস্তানি হায়নার দল।'
>
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৪১)

দেখা গেল অতিদ্রুত পাক সৈন্যরা বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জ-শহরে ছড়িয়ে পড়ল। পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিল বিহারী জনগোষ্ঠী ও কিছু স্বার্থপর বাঙালি। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হল এবং যারা যেতে পারল না, তারা অবরুদ্ধ হয়ে রইল। উত্তর পতেঙ্গা জেলেপল্লিটিও পাকিস্তানি সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। জোর-জুলুম করে তারা বেড়িবাঁধের সামনে রসিক মিয়ার বাগান বাড়ি দখল করে সেখানে ঘাঁটি গাড়ে। যুদ্ধের প্রাক্-প্রস্তুতি ও আশ্রয় নেওয়ার জন্য মেজর গিলানীর আদেশে গর্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হলে সৈন্যরা বলপূর্বক গ্রামের সাধারণ বাঙালি পুরুষদের ধরে আনে।

> 'চারো তরফসে চুতিয়া বাঙ্গালিয়োঁ কো পাকড়কে লাও। কামমে লাগাও। কাম নেহি ক্যরনে পর টরচার ক্যরো।'

(জলদাস ২০১০, পৃ. ১৪৩)

শুধু তাই নয়, পাক সৈন্যরা মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে জেলেদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন করেছে। রাধানাথকে ইন্ডিয়ার গুপ্তচর সন্দেহে বেধড়ক পেটানো হয়েছে। রাধানাথের

> 'শরীরের এখানে ওখানে হিংস্র নির্যাতনের চিহ্ন। চিবুক ফেটে রক্ত ঝরছে,...স্থানে স্থানে ফোলা, চামড়াও উঠে গেছে কোথাও কোথাও।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৫২)

পাকসেনাদের এই বর্বর অত্যাচারে দরিদ্র-লাঞ্ছিত জেলেরা ভয়ে কুঞ্চিত হয়ে পড়ে। সমুদ্রে কোনো জেলেকে মাছ ধরতে না দেওয়ার ফলে সমগ্র জেলেপাড়ায় হাহাকার দেখা দেয়। বহদ্দাররা তাদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করলেও সাধারণ জেলেদের পেট শূন্য। এরই মধ্যে পাক সৈন্যরা একরাতে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আব্দুল খালেকের ঘনিষ্ঠ সলিমুল্লাহকে গুলি করে হত্যা করেছে। ভীত জেলেরা শূন্য পেটে বাড়ি থেকে বেরোন বন্ধ করে। কারণ, মাঝেমধ্যেই পাকসেনারা যখন তখন যাকে পেরেছে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছে গর্ত খোঁড়ার জন্য। এরকমই একদিন দুপুরে মৃদুল, তপন, মিলন, সন্তোষ এবং আরো কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে তারা। এদের মধ্যে মৃদুলকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, জেলেপাড়া ও মুসলিমপাড়া থেকে তারা বিনা বাধায় কখনো কারও ছাগল, মুরগি, গোরু, ভেড়া ইত্যাদি নিয়ে যায়। উপন্যাসে দেখি-

> 'তারা পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে, সঙ্গে থাকে রাজাকারের দল। ছাগলটা গোরুটা নজরে পড়লে বলে, 'ইসে উঠা লো।' রাজাকাররা ছাগলটার সঙ্গে মুরগিটা, গোরুর সঙ্গে ভেড়াটা নিয়ে নেয়। বাধা দেওয়ার কেউ নেই।'

(জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯০)

পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতিউত্তরে জেলেরা একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ করলে তার শাস্তি স্বরূপ পাক সৈন্যরা জেলেপাড়ার সব ঘর পুড়িয়ে দেয়। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় রাধানাথের বাড়ির উঠানে চন্দ্রকলার লাশ পড়ে আছে এবং তিনটি নারকেল গাছের সঙ্গে নিকুঞ্জ, ইমাম খবির উদ্দিন ও রাধানাথের মৃতদেহ বাঁধা। জেলেপাড়া ঘিরে ফেলার আগে মেজর গিলানি সৈন্যদের উদ্দেশ্যে আদেশ দেয়-

> 'প্রথমে আনসারির দলটিকে খুঁজে বের কর; তারপর আগুন লাগাও, হত্যা কর। আমি পোড়ামাটি চাই, একজন লোকও যাতে জীবিত না থাকে। কুকুর-বেড়ালকেও ছাড়বে না। ও ওগুলোকেও গুলি করবে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯৫)

'অর্ক' উপন্যাসটিও মুক্তিযুদ্ধ প্রভাবান্বিত। জানা যায়, পাকসেনাদের অত্যাচারে এমদাদ মিয়ার মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আত্মগোপন করেছে। সমুদ্রে জেলেদের যাওয়া আসার পথে পাক সৈন্যরা তাদের নানা রকম হেনস্থা করে।

'কখনো নেংটা করে হিন্দু না মুসলমান পরীক্ষা করে, কখনো আপাদমস্তক বুটজুতা দিয়ে মাড়িয়ে উল্লাস প্রকাশ করে।...এই তো সেদিন চৌরাশির বাপকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারল পাঞ্জাবিটা।'

(জলদাস ২০১৭, পৃ. ১০৫-১০৬)

আবার 'দইজ্যা বুইজ্যা গল্পে দেখি মধ্য একাত্তরে উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়াটি পাকসৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। পাকসৈন্য দ্বারা জেলেদের ওপর শোষণ পীড়নের চিত্রটি এখানেও স্পষ্ট। সৈন্যরা জেলেপাড়ায় এসে সকলকে একত্র করে।

'তাদের দিয়ে বড়ো বড়ো গাছ কাটায়, বাঁশ কাটায়। রাজাকাররা মোটা বেতের বাড়ি মারে, রাইফেলের গুতোঁ দেয় ছেলেদের পিঠে-পাছায়। তাদের দিয়ে কাটা গাছ-বাঁশ বয়ে নিয়ে যায় নিজেদের আস্তানায়। ...

যাওয়ার সময় পাকিস্তানিসৈন্য ও রাজাকাররা খালি হাতে যায় না। মধুসূদনের ছাগলটা, মালতির হাঁস চারটি, বুড়া হারানের বাপের প্রসবোন্মুখ গোরুটি নিয়ে যায়। জেলেদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই।'

(জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.২৬)

'থুতু' গল্পেও দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধা শামসুর বাড়িতে আগুন লাগায় পাক সৈন্যরা। যাওয়ার সময় তারা গোরু ছাগলগুলো নিয়ে যায়।

'যুদ্ধের সময় চরখানপুরে বশিরউদ্দিন ভীষণ অত্যাচার চালিয়েছে। গোরু-ছাগল নিয়ে গেছে যখন ইচ্ছে, যার গোয়ালঘর থেকে ইচ্ছে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.২১৩)

অন্যদিকে 'আহব ইদানীং' গল্পে কালামুদ্দিন একজন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে আহত হয়ে সে বাড়ি ফিরে পঙ্গু জীবন কাটায়। দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে যে বীর পঙ্গুত্বকে বরণ করেছে সেই বীর যোদ্ধাদের স্বাধীন দেশে ভিক্ষাবৃত্তিকে অবলম্বন করতে হয়েছে। 'সীমানা ছাড়ায়ে' গল্পে ছৈদুলকেও মুক্তিযুদ্ধে পঙ্গু হয়ে ভিক্ষা করতে দেখা গিয়েছে।

৪.১.৩.২ সাম্প্রদায়িকতা ও শোষিত নিম্নবর্গ

সৈন্যদের আশ্রয়স্থানে খন্দক খোঁড়ার জন্য একসঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশজন জেলেদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়েছে সৈন্যরা। তাদের মধ্যে রয়েছে নিকুঞ্জ বহদ্দার। সারাদিন মাটি কাটার পর জেলে ও মুসলমানদের ভাত খেতে দেওয়া হলে জেলেরা মুসলমানদের সঙ্গে খেতে চায় না। এই দেখে বিশ্বাসঘাতক রাজাকার হামিদ বলে ওঠে-

'গোরুর গোস্তর ঝোল খাবাই বিয়াগ মালাউনেরে মুসলমান গইয্যম।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৬৬)

ক্যাপ্টেন তাদের জোর করে খাওয়ানোর নির্দেশ দিলেন হামিদ ও কয়েকজন মিলে জোর করে মুখে মাখা ভাত পুড়ে দেয়।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্বপাকিস্তানে আস্তানা তৈরি করে সমস্ত মুক্তিযুদ্ধাদের ধ্বংস করতে। ফলে তারা হিন্দু কাউকে দেখলেই ইন্ডিয়ার দালাল বলে সন্দেহ করে এবং তাদের নিপীড়ন করে। কিছু বিশ্বাসঘাতক বাঙালি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পাক সেনাদের সঙ্গে হাত মেলায়। যারা রাজাকার নামে অভিহিত। এরা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যেমনটা আমরা দেখলাম 'অর্ক' উপন্যাসে। সমগ্র পাড়ার পরিবেশ দেখে দিবাকরের অনুভূতি এরকম-

'এখন কী রকম যেন রেষারেষি। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ। পতেঙ্গার মুসলমানরা ভাবছে—হিন্দুরা ইন্ডিয়ার গুপ্তচর।...

এই যে সন্দেহ, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, পাক-ভারতের যুদ্ধের সময় হিন্দু আর মুসলমানের মনের মধ্যে হঠাৎ করে চাগিয়ে উঠল।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৪১)

এই বিদ্বেষের বলি হতে দেখা গেল নিরপরাধী নিরীহ কানাইলাল সরকারকে। সাম্প্রদায়িকতার বর্বরতার রূপ নিয়েছে 'থুতু' গল্পেও। গল্পে দেখা যায়, চরখানপুর ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান বশিরউদ্দিন রাজাকার হয়ে পাক সেনাদের সঙ্গে হাত মেলায়। যুদ্ধের সময় এই বশিরউদ্দিন চরখানপুরে ভীষণ অত্যাচার চালায়। নাপিত পাড়ার বিমল শীল একদিন বশিরের পাশ কাটিয়ে আসলে সে হুঙ্কার দিয়ে বলে

'কিথারে মালাউনের পুত, চোখে দেখছ না? আদাব-সালাম না দিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতাছছ? তুই জানছ না আমি ক্যাটা?' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৩)

ভয়ে বিমল তাকে আদাব জানালেও বশির সন্তুষ্ট হয়নি। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে কোনো এক দুপুরে রাজাকারের দল নিয়ে বিমলের বাড়িতে উপস্থিত হল। তারপর-

'বিমল, তার বউ, দুই সন্তান, বিমলের বুড়া বাপ—সবাইকে নিয়ে মসজিদ গেল। সেদিন জুমার নামাজের পর গোটা পরিবারকে মুসলমান করা হল।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৩)

নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিক ও সমালোচক জ্ঞানেন্দ্র পান্ডে, গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে কমিউন্যাল ঝগড়া ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে তাদের মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। সমালোচক অশোক সেন সাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে জানিয়েছেন-

'The Use of the term 'community' entails no denial of the existence of classes. An india of Community in immanent in Marx's concepts of classes and class struggle, particularly when he assigns a vital role to the conciousness of the exploited and their political action in negating an exploiting order. This is the crix of a 'class- for- itself' (Guha (ed.) 1987, p.227)

অর্থাৎ সম্প্রদায় হল এমন একটি শব্দ যা শ্রেণিকে সংঘবদ্ধ করে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সম্প্রদায় হল শ্রেণি, শ্রেণি-সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শোষিত হওয়ার চেতনা থেকে উদ্ভূত। সাম্প্রদায়িকতা নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর একক চেতনা যা অপর ধর্মীয় গোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। ফলে অধীনস্ত শ্রেণির শোষণ ও বঞ্চনার জন্য দায়ী।

৪.১.৩.৩ অন্যান্য রাজনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা

মুক্তিযুদ্ধের বাইরেও সমাজের সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসক দ্বারা বঞ্চিত হতে দেখা গিয়েছে 'দহনকাল' উপন্যাসে। জানা যায় আইয়ুব খানের আমলে পাকিস্তান সরকার ঠিক করে পূর্ব-পাকিস্তানকে কলকারখানায় ভরিয়ে তোলা হবে। নিঃসন্দেহে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্ত জনকল্যাণমুখী। তারা সিদ্ধান্ত নেয় এই অঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। সেই মত উত্তর পতেঙ্গা গ্রামে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার নির্মাণের একটি বড়ো কারখানা করার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান প্রশাসন। স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় হিন্দুপাড়াটিকে। সেই স্থানটি কয়েকটি পরিবারের বাসস্থানের অন্তর্গত হওয়ায় তারা ধরনায় বসে। কিন্তু তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় সরকার উচিত মূল্যে তাদের বাস্তুভিটা কিনে নেবে এবং আগামি ছয় মাসের মধ্যে জমি ছেড়ে দিতে হবে।

> 'কালক্রমে সরকার নির্ধারিত দামের দুই-তৃতীয়াংশ টাকা দিয়ে তাদের বাস্তুচ্যুত করা হলো। বলা হলো—বাকিটা পরে দেওয়া হবে। কিন্তু সরকারি প্যাঁচে ওই টাকা আটকে গেল।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৮২)

বাধ্য হয়ে তারা কেউ রাস্তার পাশে ঝুপরির মত জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে, কেউ দেশ ত্যাগ করেছে, কেউ অন্য গ্রামে বাড়ি করেছে। আদাব স্যারও ভিটেমাটি চ্যুত হয়ে বস্তি সদৃশ জায়গায় ছনের ছাউনি দিয়ে একটি ঘর তুললেন। এখানে সরকার প্রতিশ্রুত নির্ধারিত মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। 'অর্ক' উপন্যাসে দেখা যায়, প্রলয়ঙ্করী ঝড়ে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারালেও-

> 'পাকিস্তান সরকার বিপর্যস্ত অঞ্চলে কোনোরূপ মানবিক সাহায্য পাঠাল না।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১০২)

'দহনকাল' উপন্যাসের এরকম এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জেলেজীবন বিপর্যস্ত হলে বহির্বিশ্বের নানা দাতাসংস্থা এগিয়ে এসেছে সাহায্যের জন্য। তারা জেলেদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-জাল, সুতো ত্রাণ হিসেবে দান করেছে।

> 'এই সাহায্য আবার সকল জেলেপরিবার নির্বিশেষে পেল না। মধ্যস্বত্বভোগীরা নানা ছলচাতুরির মাধ্যমে লুটে নিল অনেক সাহায্য।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১৮)

দেখা গেল, মধ্যস্বত্বভোগীদের একজন হয়ে দাঁড়ালো নিকুঞ্জ। কারণ সে জেলেপাড়ায় স্বল্প শিক্ষিত। সাহায্যকারী দল শিক্ষিত লোক সন্ধান করলে নিকুঞ্জ এগিয়ে আসে। ফলে এক অর্থে নিকুঞ্জ হয়ে উঠল জেলে পাড়ার ত্রাণকর্তা। তার ওপর নির্ভর করতে লাগল সাধারণ জেলেদের ত্রাণ প্রাপ্তি। পূর্বের প্রতিশোধস্পৃহায় মত্ত হয়ে নিকুঞ্জ রাধানাথের ক্ষতি করার চেষ্টা করল।

'তাই সাহায্যপ্রার্থী জেলেদের তালিকা থেকে রাধানাথের নাম বাদ যেতে লাগল মাঝেমধ্যে; স্বজনহারাদের নাম যখন চাইল একটি দাতাসংস্থা; নিকুঞ্জ রাধানাথের নামের জায়গায় নাম লিখল রাধাচন্দ্র। দাতারা রাধাচন্দ্রকে খুঁজে পেল না। ফলে বড়ো ধরনের একটা সাহায্য প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো রাধানাথ।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১৮)

এখানেই শেষ নয়, ক্ষতিগ্রস্ত জেলেদের অর্থনৈতিক স্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য কানাডার একটি দাতা সংস্থা জেলেপাড়ায় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করল। সমিতি গঠন করার সময় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আব্দুল খালেক নবগঠিত সমিতির সভাপতি পদে বসলো এবং নিকুঞ্জ হল সাধারণ সম্পাদক। এই সমিতির সাহায্য থেকেও রাধানাথ বঞ্চিত হল নিকুঞ্জ ও আব্দুল খালেকের জন্য। দেখা গেল-

'রাধানাথ সামান্য পরিমাণে সুতা পেল। নৌকা প্রাপকদের নামের তালিকা থেকে রাধানাথের নাম বাদ দেওয়া হলো।'

(জলদাস ২০১০, পৃ. ১১৯)

বঞ্চনার এই সামগ্রিক ঘটনা থেকে আমরা তিনটি স্তর দেখতে পেলাম। দাতাসংস্থা > মধ্যস্বত্বভোগী > ক্ষতিগ্রস্ত জেলে। যদি দাতা সংস্থা সরাসরি জেলেদের সাহায্য করত, তবে সেখানে ছলচাতুরী বা বঞ্চনার প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু মধ্যস্বত্বভোগী নিকুঞ্জ ও আব্দুল খালেকের মতো স্বার্থসন্ধানী মানুষদের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করার কুফল ভোগ করেছে রাধানাথের মতো সাধারণ জেলে।

৪.১.৪ শোষিত নিম্নবর্গের নারী

ইতিহাসে নারীকে অধস্তন হিসেবে কবে থেকে দেখা হয়েছে- এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। নারী শোষণের ইতিহাস সমাজের সর্বত্র লক্ষণীয়। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক, পারিবারিক প্রায় সবদিক থেকে নারীকে Other বা 'অপর' করে রাখা হয়েছে। নারী সবযুগে, সবদেশেই শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক হুমায়ুন আজাদ তার 'নারী' প্রবন্ধে জানিয়েছেন-

'পুরুষ নারীকে সাজিয়েছে অসংখ্য কুৎসিত অভিধায়; তাকে বন্দী করার জন্যে তৈরি করেছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র; উদ্ভাবন করেছে ঈশ্বর, নিয়ে এসেছে প্রেরিত পুরুষ; লিখেছে ধর্মগ্রন্থ, অজস্র দর্শন, কাব্য, মহাকাব্য; সৃষ্টি করেছে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ও আরো অসংখ্য শাস্ত্র। এতো অস্ত্র নিয়ে প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয় নি কোনো সেনাবাহিনী। এর কারণ পুরুষের যৌথচেতনায় মহাজাগতিক ভীতির মতো বিরাজ করে নারী। তাই নারীর কোনো স্বাধীনতা স্বীকার

করে নি পুরুষ। পুরুষ এমন এক সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছে যা নারীকে সম্পূর্ণ বন্দী করতে না পারলে ধ্বংস হয়ে যাবে ব'লে পুরুষের ভয় রয়েছে। এর নাম পিতৃতান্ত্রিক, বা পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতা। পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতার প্রথম শোষকশ্রেণি পুরুষ, প্রথম শোষিতশ্রেণি নারী।' (আজাদ ১৯৯২, পৃ ১৩-১৪)

অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবদমিত অবস্থা একটি গুরুতর ঐতিহাসিক সমস্যা। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' প্রকাশিত হওয়ার পর সাম্প্রতিককালে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে। সে দিক থেকে নারীর সামাজিক অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে,

'পুরুষ শাষিত সমাজে সব নারীই এক অর্থে নিম্নবর্গ। তাই বলে নারীর কোনো শ্রেণিগত, জাতিগত, সম্প্রদায়গত পরিচয় নেই, এও সত্য নয়। সুতরাং নিম্নবর্গের নির্মাণ দেখতে হলে পুরুষশাষিত সমাজে নারীর অধীনতাও যেমন বিশ্লেষণের বিষয়, তেমনি অন্যান্য ক্ষমতার সম্পর্ক, যেমন শ্রেণি, জাতি, সম্প্রদায়, ইত্যাদি কীভাবে সেই নিম্নবর্গীয় নারীর নির্মাণটিকে আরো জটিল করে তোলে, তাও বিশেষ গবেষণার বিষয়।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.২০)

সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত মন্তব্য স্মরণে রেখে হরিশংকরের কথাসাহিত্যে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজে নারীর অবস্থানকে আমরা এক্ষেত্রে স্পষ্ট করতে পারি। ডোনা ল্যান্ড্রির নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক 'নারী' বলতে বুঝিয়েছেন,

'My own definition of a woman is very simple: it's rest on the word "Man" as used in the texts that provide the foundation for the corner of the literary criticism establishment that I inhabit …defining the Word "women" As resting on the word 'Man' is a reactionary Position … one, no rigorous definition of anything is ultimately Possible, so that if one wants to, one could go on deconstructing the Oposition between men and women, and finally show that it is a binary oposition that displaces itself.' (Landry (eds.) 1996, P-54)

স্পিভাকের মতে, তিনি কখনোই নারীর সংজ্ঞা নির্ধারক নন। একজন নারী হিসেবে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাতে তার মনে হয়েছে, 'মানুষ' একটি প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থানিক শব্দ। সেখানে কেউ চাইলে একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিরোধিতার বিনির্মাণ দেখতে পারেন। এমনও মনে করা যেতে পারে যে, এটি একটি বাইনারি বিরোধিতা যা নিজেকে স্থানচ্যুত করে। অর্থাৎ 'মানুষ' শব্দ ব্যবহারের জায়গায় শারীরিক কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যে নারী-পুরুষ ভেদ হতেই পারে, কিন্তু সমাজ নারীকে দ্ব্যণুক সম্পর্কের আড়ালে আদিকাল থেকে অধীনস্ত করে রেখেছে। আর স্বাভাবিকভাবেই নিম্নবর্গের ইতিহাস ও সমালোচনা থেকে আমরা জেনেছি অধীনস্থের বিপরীতে অবস্থান করে অধিপতি। ফলে কী সমাজ, কী রাষ্ট্র, কী সাহিত্য—সব ক্ষেত্রে নারীর শোষণ-বঞ্চনার ঘটনা বিশেষভাবে প্রকটিত। তাই গায়ত্রী

চক্রবর্তী স্পিভাক একজন নারী হিসেবে নারীর সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা করেন নিম্নলিখিতভাবে -

> 'I Construct my definition as a woman not in terms of a woman's putative essence but in terms of words Currently in use. 'Man' Is such a word in common usage. Not a word but the word.I therefore fix my glance upon This word even as I question the enterprise of redefining the Premises of any theory.' (Landry (eds.) 1996 p 54)

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজেও পুরুষের বিপরীতে নারীর দ্ব্যণুক অবস্থানে নারীর অধীনতা লক্ষণীয়। কিছু ক্ষেত্রে নারীকে সন্তান জন্ম দেওয়ার যন্ত্র হিসেবে দেখা গিয়েছে। নারীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক পীড়নের ঘটনাও লক্ষণীয়। এছাড়াও নারী-ধর্ষণ, নারী অপহরণের মতো ঘটনাও দেখা গিয়েছে কথাবিশ্বে। বর্তমান আলোচনার পরিসরে নারী শোষণ-বঞ্চনার বিভিন্ন প্রকৃতি ও ধরনগুলি আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

আমরা জানি নারী কোনো ভিনগ্রহের প্রাণী নয়। তার মধ্যেও রয়েছে চেতনা-অবচেতনার অবস্থান। নারীও সমাজ-পরিবার-অর্থনীতি দ্বারা প্রভাবিত। নারী একদিকে যেমন স্নেহ-প্রেম-ধৈর্য-মমতার প্রতিমূর্তি তেমনই অন্যদিকে হিংসা-লোভ-ক্রোধ-ক্ষোভ তাকে মাঝেমধ্যেই হিংস্র করে তুলেছে। স্থান ও পরিবেশগত কারণেই এই নারী চরিত্রায়নের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও প্রকৃতি। হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাবিশ্বের সমাজের তথাকথিত যে নিম্নবর্গের কথা বর্ণনা করেছেন সেখানে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর স্রোতে বহমান বিভিন্ন বিচিত্র নারী চরিত্র যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনই নারীদের প্রতি শোষণ-বঞ্চনার ছবিও উঠে এসেছে।

৪.১.৪.১ শারীরিক নির্যাতন ও লাঞ্ছনা

'জলপুত্র' উপন্যাসে দেখি জোনাব আলীর বাবা পুরনোপন্থী বৃদ্ধ মানুষ। সরকার একসময় তার জমির উপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করেছিল এবং সেই জমির মূল্যও শোধ করেছিল। তার ধারণা রাস্তাটির মালিক সে। ফলে জেলেদের এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্রে যাওয়ার মূল্য হিসেবে বিনা পয়সায় মাছ নেয় সে। এরকমই একদিন বংশীর মা ও ভুবনেশ্বরী মাছ ভর্তি খাড়াং নিয়ে এই পথ দিয়ে গেলে পেছন থেকে জোনাব আলির বাবা তাদের দাঁড়াতে বলে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। কারণ বংশীর মা আগের দিন তাকে মাছ না দিয়ে চলে গিয়েছে। বংশীর মা 'জনইপ্যার বাপ'কে মুখ খারাপ করতে মানা করলে, ক্ষেপে গিয়ে সে বলে,

> 'ধুত্তোর মুখ খরাপর মারে চুদি, মুখ খরাপ মারাঅদ্যে না, খানকি।' বলে এক ঝটকায় বংশীর মায়ের মাথা থেকে মাছের খাড়াংটা মাটিতে ফেলে দিল জোনাব আলীর বাপ।...

বংশীর মা অসহায় দৃষ্টিতে জনইপ্যার বাপের দিকে তাকিয়ে থাকল।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৬৮)

জোনাব আলির বাবা এ ধরনের অন্যায় ও বংশীর মা'র অসহায়তা সমাজে পুরুষ ও নারীর বিপরীত অবস্থানকে স্পষ্ট করেছে। যেখানে একদিকে প্রতাপের প্রদর্শন অন্যদিকে অধীনতার অসহায়তা উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, এরকমই লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের সাক্ষী আমরা হয়েছি, যখন কর্ণফুলী নদীর পাড়ে কমলমুন্সির হাটে মাছ বিক্রি করাকালীন এক মধ্যবয়সী লোকের হাতে ভুবন লাঞ্ছিত হয়েছে। দেখা যায়, হাটে ভুবন ইচা মাছ নিয়ে বসেছে। মাছগুলো তাজা বলে তার সামনে অনেক ক্রেতার ভিড়। এরই মধ্যে একজন মধ্যবয়সী লোক হঠাৎ চিৎকার করে বলে-

'অই ডুমিনি, কঁত্তেত্তোন দাম পুচ গরির দে, দাম কা নো কঅর? বলেই সে ছাতার বাঁট দিয়ে ভুবনের মাথায় ঠেলা দিল।

বাঁটের ঠেলায় ভুবন চিৎ হয়ে পড়ে গেল। তার হাতে-মুখে-গায়ে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০১)

ঘটনাটি ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায়, প্রথমত ক্রেতাদের ভিড় ও শোরগোলে ভুবনের সকলের কথা না শোনাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মধ্যবয়সী লোকটি মাছের দাম বারবার জিজ্ঞেস করার দাবি জানিয়ে ভুবনকে 'ডুমিনি' বলে ছাতার বাঁট দিয়ে তাকে আঘাত করেছে। আঘাতের আসল আভ্যন্তরীণ কারণ হল, সেই ভদ্রলোকের বিরক্তি ও দম্ভ। তার কথার মধ্যেই ধরা পড়েছে সেই দম্ভের আস্ফালন। সে মনে করেছে যে, তার মতো ক্ষমতাবান মানুষের কথার উত্তর না দেওয়ার সাহস কীভাবে হয় একজন সামান্য জেলেনারীর। মূলত এই কারণেই সেই লোকটির এ ধরনের অন্যায় আঘাত করা।

শুধু সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, পারিবারিক ক্ষেত্রেও নারীরা লাঞ্ছিত-নিপীড়িত। যেমন 'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাসে মৎস্যসমাজের পাশাপাশি যতটুকু জেলেসমাজ অর্থাৎ মানব সমাজের কথা উঠে এসেছে সেখানে দেখা যায়, উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের চিন্তামণি বহদ্দারের দুই ছেলে—ঝলক ও পুলক। ঝলক গাঁজাখোর। চিন্তামণি ঝলককে বিয়ে করানোর পর থেকেই সে তার স্ত্রীয়ের প্রতি শারীরিক নির্যাতন করেছে। উপন্যাসের বর্ণনানুযায়ী-

'গেজেল ঝলক শুধু বউ পেটায়। মারের চোটে বড়ো বউ হাঁইচনি বালা বিলাপ করে, 'ও মারে, আরে কিয়ল্লাই এই পোড়া কোয়াইল্লার লগে বিয়া দিয়চ রে মা? দেওতাছাড়ার মাইর আঁই ত আর সইয্য গরিত্ নো পারির রে মা!'

(জলদস ২০১৯(খ), পৃ. ৯২-৯৩)

ঝলকের এভাবে স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করার পেছনে কোনো যে কারণ নেই তা চিন্তামণির কথাতেই স্পষ্ট। শ্বশুর হিসেবে পুত্রবধূর লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারে না সে। তাই ক্ষোভে গালাগাল করতে থাকে সে। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে ওঠে-

'কুত্তার বাইচ্চা হুদা হুদা বউয়েরে মারের কা? বউ পিডাইতে ভালা লাগে না খানকির পোয়াত্তোন?'

(জলদস ২০১৯(খ), পৃ. ৯৩)

চোখের সামনে পুত্রবধূকে নির্যাতিত হতে দেখে চিন্তামণি ও মোরেশ্বরী নিজেদের মধ্যে সমালোচনা ছাড়া আর কিছু করতে পারে না, তারা জানে যে ঘরে নারী জাতি লাঞ্ছিত হয় সে ঘরে শ্রী থাকে না। ছেলের এই অন্যায়ে মায়ের মুখ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসে-

'হিতে নিষ্ঠুর। বেইমান হিতে। দিন-রাইত যে বউঅর সেবা ল, হেই বউয়েরে পিডায়। ধ্বংস হই যাইবো ঝলইক্যা।'

(জলদস ২০১৯(খ), পৃ. ৯৪)

স্বামীর হাতে স্ত্রী নির্যাতনের ঘটনা একইভাবে চোখে পড়ে 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসে। লক্ষণীয় সুধাংশু তার বড়ো মেয়ে ফাল্গুনীর বিয়ে দেয় শিকলভাঙা গ্রামের এক শিক্ষিত ছেলে অরবিন্দের সঙ্গে। বিয়ে দেওয়ার সময় পাত্র সম্পর্কে ভালোমতো খোঁজ খবর না নিয়ে একপ্রকার তাড়াহুড়ো করে মেয়ের বিয়ে দেয় সুধাংশু। কিন্তু বিয়ের প্রায় এক বছর পর সুধাংশু তার দূর সম্পর্কের সুশীলা পিসির কাছে অরবিন্দের আসল চেহারার সন্ধান পায়। সুশীলা পিসি জানায়-

'চাকরি থেকে ফিরেই অরবিন্দ জুয়ার আড্ডায় বসে যায়। ছুটিছাটার দিনে রাতে-দিনে বিরামহীন জুয়া খেলে যায় অরবিন্দ। বাপ-মায়ের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই অরবিন্দের ওপর। মাঝে মাঝে মদ গিলে বাড়ি ফিরে সে। ফাল্গুনীর সঙ্গে ঝগড়া করে। তার গায়ে হাত তোলে। ফাল্গুনীর কান্নার আওয়াজ এই পাড়ার আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায়।'

(জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৭৯)

ফলে কন্যা অন্তপ্রাণ মাতা-পিতার মানসিক অবস্থা ভাঙতে থাকে। অবসর সময়ে উঠোনের এক কোণে বসে বিলাপ করে মা অহল্যা।

'তোর গায়ে কোনোদিন হাত তুলিনি রে মা, ফুলের একটা বাড়ি পর্যন্ত দিই নি তোর গায়ে। আমার পরম আদরের কন্যা ফাল্গুনী আজ শ্বশুরবাড়িতে পড়ে পড়ে মার খাচ্ছিস! হা ঈশ্বর! এই অন্যায়ের প্রতিবাদ আমি কী করে করব! কার কাছে বিচার চাইব প্রভু! (জলদস ২০১৯, পৃ.১৮৩)

লক্ষণীয়, স্ত্রীকে নির্যাতন করার পর অরবিন্দের মধ্যে কোনো ভাবান্তর নেই। ফাল্গুনীর অসহায়তা ও প্রতিবাদহীনতাকে নারীর দুর্বলতা মনে করে তার ওপর আরো নির্যাতন করা হয়েছে। অন্যদিকে নিজের কন্যা সন্তানের এরকম শারীরিক নির্যাতনের কথা জেনেও একজন মায়ের অসহায়তা ও নিরুপায় অবস্থা দেখে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে নিম্নবর্গ করে রেখেছে। এর কারণ ব্যাখ্যা

করলে দেখা যায়, জেলেসমাজে একজন নারী পরিবারের আভ্যন্তরীণ কাজকর্ম ও সন্তান সামলানোর পাশাপাশি জেলেপুরুষের উপার্জনেরও সহায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তাদের থাকে না। ফাল্গুনীর ক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা অনেকাংশেই তাকে প্রতিবাদহীন করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত, পুরুষের সামর্থ্য ও বাহুবলের কাছে নারীর বাহুবল অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার সুযোগ নেওয়া হয়েছে। ফাল্গুনীর এইভাবে পড়ে পড়ে মার খাওয়া তাই নিরুপায় হয়ে সহ্য করতে হয় আর একজন নারীকে, যে তার জন্মদাত্রী মা অহল্যা। তাই বিলাপ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ থাকে না তার। সর্বোপরি একজন নারীর ক্ষমতায় যতটা মানিয়ে নেওয়ার প্রবণতা থাকে, তার অধিকাংশই একজন পুরুষের মধ্যে থাকে না। অন্তর্জগৎ হোক বা বহির্জগৎ- পুরুষ ধ্বংস করে, নারী সেখানে সৃষ্টি করার মানসিকতা পোষণ করে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'The nation and Its Women' প্রবন্ধে জানান একজন নারী কীভাবে তার পরিবার, জীবনের বহমানতাকে বহির্জগৎ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

> 'Further, within the human species,Women cultivate and cheris these god like qulities for more than do men. Protected to a certain extent from the purely material pursuits of securing a livelihood in the external world, women express in their apearance and behavior the spiritual qualities that are characteristic of civilized and refind human society.' (Guha (ed.) 1997, p- 250-51)

যে নারী সমাজের জন্য, পরিবারের জন্য, সভ্যতার জন্য নিজেকে উজাড় করেছে প্রতিটি ক্ষেত্রে সেখানে সেই নারীই চার দেওয়ালের মধ্যে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছে। এ কেবল সাম্প্রতিককালের প্রতিফলন নয়, যুগ যুগ ধরে নারীরা এভাবেই অবহেলিত ও নির্যাতিত। কাল, সমাজ নির্বিশেষে নারী অবমাননা সাহিত্যেও উঠে এসেছে বারংবার। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বেও এর অন্যথা হয়নি। 'দুখিনি' গল্পে দেখি, কিষ্টপদ ও রসবালার দাম্পত্য জীবন বছর সাতেক সুখকর কাটলেও অভাব ও দারিদ্র্য সংসারের আনন্দগুলো মুছে দিয়েছে ধীরে ধীরে। কিষ্টপদর নিজস্ব জাল-নৌকা ছিল না বলে সে দিনমজুরের কাজ নেয়। কিন্তু তাতেও সংসারের অভাব দূর হয় না। ফলস্বরূপ মাঝে মাঝেই স্বামী-স্ত্রীতে বচসা শুরু হয়। বচসার একপর্যায়ে ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কিষ্ট রসবালাকে পেটায়। স্ত্রীকে পেটাতে পেটাতে একসময় ক্লান্ত হয়ে কিষ্টপদ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। অন্যদিকে অসহায় রসবালা বিলাপ করে-

> 'এই ভাদাইম্যার হাতত্ পড়ি আঁর জীবননান্ ছারখার অই গেল্গই। অলইক্ষা, ভাত দিত্ নো পারের, কিলাই কিলাই আঁর হাড্ডিগুড্ডি জর জর গরি ফেলাইলো রে মা।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.৪১)

অন্যদিকে 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে মহেশখালি জেলেপল্লির এক দরিদ্র ঘরের দুলারি চট্টগ্রাম শহরে আসে উপার্জনের আশায়। সেখানে শ্যামল দত্ত নামের এক জোচ্চরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয় দুলারির। তারা বিয়ে করে। বিয়ের প্রায় এক বছর পর তাদের সন্তান হয় এবং দুলারি একদিন জানতে পারে

শ্যামল আগে থেকেই বিবাহিতা। সে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এই নিয়ে তাদের মধ্যে বচসার সূত্রপাত হলে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে শ্যামলের। ক্ষোভে, ক্রোধে সে দুলারিকে চড় মারে-

'প্রচন্ড একটা চড় বসাল শ্যামল দুলারির বাম গালে। ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেল দুলারি।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ .৯৪)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা মান-অভিমান পরিবার ও সংসারের ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক হলেও নারী প্রহার আসলে এক প্রকার দমননীতিরই প্রতিফলন। কিছু ক্ষেত্রে তা এমন রূপ নিয়েছে যাতে একজন নারীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। এরকমই ঘটনা আমরা লক্ষ করি 'ভাঙন' গল্পে। গল্পে জানা যায়, বগলা নদীর তীর ঘেঁষে অবস্থিত ডোমপাড়ার নামকরা ডোম দয়ালহরি স্ত্রীর সঙ্গে কোনো কারণে বচসা বাঁধে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে

'...বউয়ের বাম কান বরাবর একটা থাপ্পড় বসিয়ে ছিল দয়ালহরি। ওই এক থাপ্পড়েই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গিয়েছিল যশোদার।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৪৬)

ইতিপূর্বে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক একজন নারীর চোখ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নারীকে সংজ্ঞায়িত করার সময় পুরুষ ও নারী অবস্থান প্রসঙ্গে বলেছিলেন- 'It is a binary oposition that displaces itself.'—এর সত্যতা আমরা বংশীর মা, হাইচনিবালা, ফাল্গুনী, দুলারি, রসবালা ও যশোদার ক্ষেত্রে লক্ষ করলাম কারণ স্পিভাকের মতে-'... 'Woman' as resting on the word 'man' is a reactionary position.' উল্লেখিত এই 'Reactionary position' এর কারণে নারী ও পুরুষের মধ্যে দ্বিমুখী বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে।

'রামগোলাম' উপন্যাসের সমাজ বর্ণনা প্রসঙ্গে উঠে এসেছে নারী নিপীড়নের ঘটনা। আমরা জানি মেথররা সমাজের দুর্গন্ধময় নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করে বলে মানসিকভাবে তৈরি থাকার জন্য তারা মদের নেশা করে। মদের নেশা মেথর সমাজে প্রচলিত ও স্বাভাবিক। কিন্তু এই মদের নেশার জন্যই অনেক পরিবারের শান্তি বিনষ্ট হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। উপন্যাসে দেখি, মেথর সমাজে নারীরা কর্মঠ। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও করপোরেশনে ঝাড়ুদারের কাজ করে। কিন্তু জীবনযাপনের হিসেব দেখলে বোঝা যায়-

'মেথরসমাজে সন্তান ধারণ করা থেকে লালনপালন, অসুখে রাতজাগা থেকে মন্দিরে পুজো, বাজার করা থেকে ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া—সবই নারীদের কাজ। পুরুষরা শুধু বউয়ের পেটে সন্তান আনবে, টাকার জন্য বউ পেটাবে ...'

(জলদাস ২০১২, পৃ. ৪৯)

যদিও মেথরপট্টির কিছু পরিবারের পুরুষরা মদের নেশা থেকে মুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ মেথর পরিবার মদ গাঁজার নেশার কারণে সাংসারিক ও পরিবার জীবন বিপন্ন ও বিধ্বস্ত। তাইতো মেথরানীরা নিরুপায় হয়ে মন্দিরে কালীমাতার কাছে প্রার্থনা করে-

> 'হে মা কালী, তুমি আমার মরদের মধ্যে সুবুদ্ধি সৃষ্টি করো। সে যেন মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়—এই আশীর্বাদ করো মা। নিজের আয়ের টাকা সে মদের পেছনে উড়ায়; সন্ধেয় আমার ইনকামটাও কেড়ে নেয় সে। ...টাকা না দিলে পেটায় আমাকে, চুলের মুঠি ধরে বেদম পেটায়।' (জলদাস, ২০১২, পৃ. ৪২)

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা লক্ষ করলাম নারী মূলত নির্যাতিত হয়েছে একজন পুরুষের দ্বারা। সে ঘরেই হোক বা বাইরে। সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে অর্থে একজন নারীকে নিম্নবর্গ রূপে গণ্য করেছেন, সেখানে মূলত গ্রামশি কথিত নিম্নবর্গের অধীনতার চেতনা, তাদের সীমিত শক্তির কথাই প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক ডেভিড আর্নল্ড নিম্নবর্গ সম্পর্কে গ্রামশির বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন-

> 'Gramsci's use of the term 'subaltern' further invites us to apreciate the common properties of subordinate groups as a whole - the shared fact of their subordination, their intrinsic weaknesses, their limited strengths.' (Chaturvedi (ed.) 2000, p.33)

অর্থাৎ 'Subaltern' শব্দ ব্যবহারের মধ্যে সেখানে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকে তাদের অধীনতা, দুর্বলতা ও সীমিত শক্তি। এই বক্তব্যকেই যখন আমরা কোনো স্ত্রীয়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে যাই তখন দেখা যাবে, একজন স্ত্রী তার স্বামীর অধীনতা স্বীকার করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণে চাহিদা পূরণের ভিত্তিতে। দ্বিতীয়ত, পারিবারিক পরিমণ্ডলে সন্তানের জননী হিসেবে ও পারিবারিক সম্পর্কের আড়ালে সে দুর্বল এবং তৃতীয়ত, তার সীমিত দৈহিক শক্তি। নারীর এই সীমিত গণ্ডির মধ্যে একজন পুরুষ তার সর্বস্ব শক্তি আরোপ করলে নারীর কোনোঠাঁসা অবস্থা অনিবার্য। ফলে স্বামীর হাতে তারা প্রায়শই প্রত্যাখ্যাত হয়, প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু তবুও পরিবারের সম্পর্কে দূর্বলতার জালে জড়িয়ে একজন নারী অসহায় ও প্রতিবাদহীনভাবে ঘরের এক কোণে মুখ বুজে পড়ে থাকে। ঐতিহাসিক সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় নারীর অসহায়তা ও মানিয়ে নেওয়ার আদর্শকেই নারী সুলভ আচরণ বলেছেন। জীবনের বাহ্যিক অবস্থা ও নারীসুলভ আধ্যাত্মিক গুণাবলী একজন নারী কোনো অবস্থাতেই হারাতে নারাজ। কারণ নারীর এই গুণাবলীর কারণেই বাড়ি সংসারে পরিণত হয়, সংসার পরিবারে পরিণত হয়। নারীর এই আচরণ আসলে তাদের এক প্রকার শক্তি, কিন্তু একজন পুরুষের সঙ্গে তার দ্ব্যণুক বৈপরীত্য ক্ষমতার প্রতিফলনে তাদের শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত হতে হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী-

> ‘The home was the principal site for expressing The Spiritual quality of the national culture, and Women must take the main responsibility for protecting and nurturing this quality. No matter about the changes in the external condition of life for women, they must lose their essentially Spiritual (that is, faminine) vertues; they must not,..’. (Guha (ed.), 1997(b) p. 251-52)

সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর বিতর্কিত প্রবন্ধ ‘Can the Subaltern Speak?’ প্রবন্ধে নিম্নবর্গের প্রতিবাদের ধরন ও চেতনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নারী সংক্রান্ত আলোচনাকে বিশেষভাবে নিম্নবর্গের ইতিহাস ব্যাখ্যায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। নারীকে পৃথকভাবে নিম্নবর্গের আত্ততাভুক্ত করার বিভিন্ন কারণ উদাহরণসহ দেখিয়েছেন। বিশেষ করে নারী ধর্ষণের প্রসঙ্গে তিনি জানান-

> ‘In the former case, a figure of ‘women’ is at issue one where minimal prediction and indeterminate is already available to the phallocentric tradition… For The figure of women the relationship between women and silence can be plotted by women themselves race and class differences are subsumed under that change. Subaltern Historiography must confront the Impossibility of such gestures.’ (Ashcroft (ed.) 1997, p. 82)

অর্থাৎ নারীর শারীরিক গঠন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যা কিনা সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বিরাজমান। নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনায় নারীর এই অবস্থাকে অবশ্যই একটি বিশেষ অঙ্গভঙ্গির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর ‘The Differentiation between men and women’-প্রবন্ধে নারী ও পুরুষের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেন,

> ‘As we all know, it is not unfill pubcrty that the sharp distinction is established between the masculine and feminine characters…. It is true that the masculine and feminine disporitions are already easily recognizable in childhood. The development of the inhabitation of sexuality (shame, disgust, pity, etc.) takes place in little girls earlier and in the face of less resistance than in boys; The tendency to sexual repression seems in general to be greater; and where the component instimets of sensuality apear, they prefer the passive form.’ (Freud 1962, p 85)

আমরা জানি যৌনমনস্তত্ত্ব অনুযায়ী একজন পুরুষ অধিকার করে এবং একজন নারী অধিকৃত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। ফ্রয়েড তাঁর যৌন মানসিক বিকাশ তত্ত্বে জানিয়েছেন মানুষের মন প্রচণ্ডভাবে গতিশীল। ফলে আমাদের চিন্তা ও চেতনার গতি আলোর গতির চেয়েও বহুগুণ বেশি। কিন্তু যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজের রয়েছে কিছু বিধি নিষেধ। সমাজ ব্যবস্থার সমস্ত বাধা ও বিরোধকে মেনে নিয়ে আমাদের জীবন ধারণ করতে হয়। ফলে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নই। মানব মনের যে কামনা-বাসনা ও যৌন তাড়না উদ্দীপিত হয় তা এই বাধা নিষেধের ফলে অতৃপ্ত থেকে যায়। বাধ্য হয়ে সেই ইচ্ছেগুলোকে অবদমিত করতে হয়। এই অতৃপ্ত ইচ্ছেগুলোই স্থান করে নেয় আমাদের অচেতন স্তরে। ফলে এই অবদমনের চেষ্টা থেকে আমাদের মনে সৃষ্টি হয় এক বিপরীতমুখী বিরোধের যা কিনা লজ্জা,

ঘৃণা, ভয়, দুঃখ ইত্যাদি নেতিবাচক অনুভূতি সহ এক মানসিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। আসলে কামপ্রবৃত্তির উপস্থিতি হল একজন মানুষের জৈবিক সংগঠনের মৌলিক উপাদান। যার ফলে একজন শিশুর জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আত্মকামী সত্তা হিসাবে যৌন অনুভূতি কেন্দ্রিক কামপ্রবৃত্তির দিকে এগিয়ে যায়। এই কামসত্তার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে রয়েছে প্রেম, ভালোবাসা, বন্ধুপ্রীতি, আদর, সোহাগ ইত্যাদি এবং এর বৈশিষ্ট্য হিসাবে ফ্রয়েড কিছু তাত্ত্বিক ধারণার উল্লেখ করেছেন। যেমন ইদিপাস এষণা, ইলেক্ট্রা এষণা, মর্ষকাম, ধর্ষকাম, জীবনবৃত্তি এবং মরণবৃত্তি। একজন পুরুষ শিশু আত্মকাম প্রবৃত্তির ফলে বিপরীত লিঙ্গ মায়ের প্রতি যে যৌন আকর্ষণ অনুভব করে এবং একই লিঙ্গ হওয়ার কারণে পিতার প্রতি যে ঈর্ষা পোষণ করে একেই ফ্রয়েড ইদিপাস এষণা বলেছেন। আবার এর বিপরীত ক্রিয়ায় একজন স্ত্রী শিশুর পিতার প্রতি আকর্ষণ ও মায়ের প্রতি ঈর্ষা অনুভব করাকে বলা হয়েছে ইলেক্ট্রা এষণা। মর্ষকামের প্রবৃত্তি হল ভালোবাসার মানুষের হাতে নিগৃহীত হয়ে যৌন সুখ নেওয়া এবং ধর্ষকাম হল ভালোবাসার মানুষকে নিপীড়ন করে যৌন তৃপ্তি পাওয়া। মূল কথা হল, একজন নারী বা পুরুষ তাদের জৈবিকসত্তা নিয়েই নিজেকে সম্পূর্ণ অনুভব করে। কিন্তু সমাজ-সংস্কার নারী পুরুষকে সমান মর্যাদা দেয়নি। এর কারণ হিসাবে রয়েছে একাধিক যুক্তি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা। (Freud 1962, p 85-87)

প্রথমত, নারীদের অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে আছে পুরুষের পেশি শক্তি।

দ্বিতীয়ত, একজন পুরুষের সত্তায় রয়েছে অধিকার করার ইচ্ছা এবং নারীর মধ্যে রয়েছে অধিকৃত হওয়ার অপেক্ষা।

তৃতীয়ত, যৌন সঙ্গমকালে একজন পুরুষ নারীকে বশ করে, লিঙ্গ দ্বারা বিদ্ধ করে।

তবে আমাদের মনে হয়েছে যৌনতা ও ধর্ষণের মধ্যে রয়েছে সম্মতির পার্থক্য। নারী পুরুষ কিংবা সমকামীর সম্মতিতে যখন কোনো যৌন মিলন সংগঠিত হয় তখন সেটা যৌনতা এবং কোনো একজনের অসম্মতিতে সেই ক্রিয়া সম্পন্ন হলে তা হবে ধর্ষণ।

নারীদের অবমূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে পুরুষের পেশীশক্তি প্রদর্শন এক অর্থে নারী-পুরুষের অবস্থানের প্রেক্ষিতে হেজেমনির প্রয়োগ। নারী শোষণ বা ধর্ষণ সমাজ সৃষ্টির আদিকাল থেকেই একটি গুরুতর সমস্যা। দেশকাল নির্বিশেষে নারী ধর্ষণের মতো ঘটনায় সমাজ আক্রান্ত। তবে একথা অনস্বীকার্য যে হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে বর্ণিত নিম্নবর্গের সমাজে অবৈধ সম্পর্কের ভিত্তিতে যৌনতার কথা রয়েছে। বিশেষ করে জেলেসমাজের বর্ণনায় আমরা বারবার এই শারীরিক সম্পর্কের কথা পেয়েছি। নিম্নবর্গীয় সমাজে এই অবৈধ সম্পর্ক বা যৌন বর্ণনা আমাদের কোনোভাবেই অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম মনে

হয়নি। বরং তা তথাকথিত সমাজ বাস্তবতাকে বজায় রেখেছে। কিন্তু নারী ধর্ষণ প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। হরিশংকর জলদাস তাঁর কথাসাহিত্যে ধর্ষণের মধ্য দিয়ে একজন পুরুষ তার বিপরীতে নারীকে কীভাবে নিম্নবর্গ রূপে নির্মাণ করেছে তাঁর রূপকল্পটি স্পষ্ট করেছেন। আলোচনার এই পরিসরে আমরা সেই দিকটা দেখে নেব।

'দহনকাল' উপন্যাসে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে জনজীবন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে যখন মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে পাকিস্তানী সৈন্যরা জেলেপাড়াকে চারিদিক দিয়ে ঘিরে তাদের আস্তানা তৈরি করে। এই ঘটনার প্রায় সাত দিনের মধ্যে পাক সৈন্যরা উত্তর পতেঙ্গা জনজীবনকে অস্থির করে তুলেছে। তাদের সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হল জেলেপাড়ার আব্দুল খালেক ও তার রাজাকার বাহিনী। তাদের কাজ হল জেলেপাড়াকে ভীতসন্ত্রস্ত করে রাখা যাতে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে না পারে। এই ভয় দেখানর নামে তারা দিনে-রাতে যেকোনো সময়ে জেলেপাড়ায় ঢুকে নারী ধর্ষণ শুরু করে। এরকমই একদিন পাক সৈন্য দলের প্রধান আসরাত আনসারি ও তার দলবল সন্ধের সময় রাধেশ্যামের বউকে একা পেয়ে ধর্ষণ করেছে। দেখ গেল-

> 'আনসার বেরিয়ে এলে একে একে অন্য চারজন বর্বর সেই ঘরে ঢুকল আর বেরোল, বেরোল আর ঢুকল।
>
> ধর্ষণ প্রক্রিয়াটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাজাকার সেলিম ও খলিল বুক টান করে ঘরটির সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। তাদের চোখে-মুখে রতিক্রিয়ারত হায়নার উল্লাস।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৭১)

দিনের পর দিন জেলেপাড়ায় পাক সৈন্যের এই ধরনের বর্বর অত্যাচারে জেলেপল্লি বিধ্বস্ত। সকলের মনেই নারী লাঞ্ছনার আতঙ্ক। আমরা লক্ষ করলাম- পাড়ার অন্যান্য জেলেনারী ও জেলেকন্যার মতো পরিমলের বউও ভীত ও আতঙ্কিত। সেই আতঙ্কের ফলে ঘরের মেয়েদের ঠাকুরমারা

> 'কারও নজরে না-পড়ার জন্য ছেঁড়াফোঁড়া শাড়ি পরিয়ে রাখে, ঘরের বাইরে যেতে দেয় না। এই জেলেপল্লির প্রতিটি অবিবাহিত মেয়ের মুখে-গলায় মায়েরা ঠাকুমারা দিনের শুরুতেই পাতিলের তলা থেকে কালি নিয়ে লেপ্টে দেয়, যাতে কোনো হায়নার চোখ না পড়ে সেই মুখে।' (জলদাস ২০১০, পৃ.১৭৬)

অন্যান্য দিনের মতো পরিমলের বউকেও দেখা যায় তার মেয়ের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। হামিদ, এমদাদ, সেলিমদের মতো নৃশংস রাজাকাররা মিলে বিশাখাবালাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। পরের দিন সকালে-

> 'পরিমলের মেয়ে বিশাখাবালাকে পাওয়া গেল চানমিয়ার কলাবাগানে। ...সেই কলাবাগানের মাঝে বিশাখাকে পাওয়া গেল অচৈতন্য অবস্থায়। রক্তাক্ত, মুখে-গলায় আঁচরের দাগ, ব্লাউজ ছেঁড়া।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৭৭)

উপন্যাসে জানা যায়, আসরাত আনসারি নারীলোভী। জেলেপাড়ায় যত ধর্ষণ হয়েছে তার পেছনে রয়েছে আসরাত আনসারির লোলুপ কামনা। যে কারণে পাকিস্তান প্রশাসক তাকে পূর্ব-পাকিস্তানে

পাঠিয়েছেন তা আনসারির কাছে মুখ্য নয়। নারী শরীর ভোগ করাটাই তার কাছে কাম্য। তাই একদিন জেলেপাড়া পরিদর্শনে বেরিয়ে সে জেলেপাড়ার মসজিদের ইমাম খবিরউদ্দিনের বাড়িতে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু রাজাকার হামিদ আনসারির এই ইচ্ছার বিরোধিতা করে বলে ইমামের স্ত্রীকে ধর্ষণ করা অপরাধ। কিন্তু আনসারির চোখ তখন কাম লোলুপ। সে হামিদকে আঘাত করে বলে-

> 'রেহেনে দে গুনাহ্। হামে পূর্ব পাকিস্তান মে ভেজা দুশমনকো খাতাম ক্যরকে ছোয়াব কামানে কে লিয়ে। হাম ইয়াহাঁ যো ভি ক্যরেঙ্গে ছোয়াব কামানে কে লিয়ে ক্যরেঙ্গে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯১)

এখানে আসরাত আনসারির কথাতে স্পষ্ট যে তার হাতে আছে সেই ক্ষমতা যার অপপ্রয়োগে সে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি সাধারণ জনজীবনকেও বিপর্যস্ত করতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় প্রভুশক্তি মুক্তিযোদ্ধাদের বিনাশের উদ্দেশ্যে সৈন্যদের ক্ষমতা প্রদান করলেও তাদের হাতে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটেছে। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদমন করতে এসে পাক-সৈন্যরা নারী ধর্ষণ করে অমানবিকতা ও নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে।

'অর্ক' উপন্যাসেও লক্ষণীয়, সর্বানন্দের কুমারী মেয়েকে ধর্ষণ করে যায় চারজন পাক-সেনা। এরকমই ঘটনা ঘটতে দেখা যায় 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে। উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেপাড়ার জগমোহনের কন্যা পারুলবালাকে ক্যাপ্টেন মার্শেদ ধর্ষণ করেছে। পাক-সৈন্যের নৃশংস অত্যাচারে জেলেপাড়া আতঙ্কিত। কিন্তু পাকসেনাদের হাত থেকে মুক্তি নেই তাদের। পারুলকে প্রথমবার ধর্ষণ করার বেশ কিছুদিন পর ক্যাপ্টেন মোর্শেদের স্ত্রী প্রেরিত চিঠিতে জানতে পারে, স্ত্রী তার জন্য অপেক্ষারত। ফিরে যাওয়ার প্রার্থনায় মোর্শেদ বড়ো তৃপ্তি বোধ করে। বউয়ের চিঠি তার শরীরে কাম জাগায়। রাজাকার মজিদের বুঝতে অসুবিধে হয় না মোর্শেদের এখন একজন নারীর সঙ্গ প্রয়োজন। তাই সে তাকে জেলেপাড়ায় জগমোহনের বাড়ির সামনে নিয়ে আসে। পারুলকে ঘরে না পেয়ে তার মা তোতারানিকেই ভোগ করে মোর্শেদ।

ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী নারীরা যেখানে মা ও দেবীর সঙ্গে তুলনীয় সেখানে নারীজাতি সমস্ত রকম আধিপত্যের শিকার। তাদের প্রতি সহজে জোর-জুলুম করা যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাই ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে নারী অবস্থান সম্পর্কে তাঁর 'The Nation and its women'-প্রবন্ধে জানিয়েছেন,

> 'As with all hegemonic forms of exerciring Dominance, this patoriaehy eombined coercive authority with the subtle force of persuasion. This was expressed most generally in the intervate ideological form of the relation of power between the sexes: the adulation of woman as goddess or as mother.'
>
> (Guha (ed.) 1997(b), p 256-57)

অর্থাৎ নারীর প্রতি অবমাননা আসলে দুই বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার সম্পর্ক যা সাধারণত আদর্শগতভাবে প্রদর্শিত হয়। তা সে রাজনৈতিকভাবেই হোক, অর্থনৈতিকভাবেই হোক বা যৌনতার দিক থেকেই হোক, নারী শোষণ একপ্রকার 'Hegemonic forms of exercising dominance'। তবে শুধু রাজনৈতিক কারণেই যে হরিশংকরের কথাসাহিত্যে নারী ধর্ষণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এমন নয়। সমাজের সব ক্ষেত্রেই নারী ধর্ষিত। আসলে নারী যেখানেই একা, যেখানে সে অসহায়, যেখানে সে নিরুপায় সেখানেই পুরুষ তার সুযোগ নিয়েছে, নারীকে ধর্ষণ করেছে। সাহায্যের বিনিময়ে নারীদেহ ভোগ করেছে। 'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পে দেখি দুলারি শ্যামল দত্তের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। অসহায়-নিরুপায় দুলারির কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে সে একরাতে অসহায় অবস্থায় বহদ্দারহাটে আশ্রয় নেয়।

'সেখানে প্রথম রাতেই দুলারি ধর্ষিতা হল। দু'জন ষন্ডা তাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে রক্তাক্ত করল। বস্তি ছাড়ল সে। তারপর ভেসে চলা—এ-জায়গা থেকে ও-জায়গায়, এ-ফুটপাত থেকে সেই ফুটপাতে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৯৪-৯৫)

ফুটপাতে এসেও দুলারিরা নিস্তার পায় না। অসহায় একজন নারীকে পাড়ার জগলু মস্তান ও তার দল মিলে কিছু খাবারের বিনিময়ে শারীরিকভাবে শোষণ করেছে। কিছু ক্ষেত্রে দুলারির শারীরিক শোষণ করেও বিনিময়ে কিছুই না দিয়ে চলে যায় তারা। ক্ষুধার যন্ত্রণা ও মানসিক বিপর্যস্ত দুলারি তাই ভদ্রলোক দেখলেই ক্ষেপে গিয়ে নিরন্তর গালাগাল দিতে থাকে।

'থুতু' গল্পেও নারীর অসহায়তা একাকিত্বের সুযোগ নিতে দেখা গিয়েছে। গল্পে মুক্তিযোদ্ধা শামসুর যুদ্ধে আহত হয়ে ফিরে আসলে তাদের নিজস্ব গ্রাম খড়গপুর থেকে উৎখাত হতে হয়। তারা নিরুপায় হয়ে আশ্রয় নেয় এক বস্তিতে। শামসুর ও তার স্ত্রী নিলু বেগম উপার্জনের আশায় কাজে বের হলে তাদের একমাত্র সন্তান ফারহানা ঘরে একা থাকে। এই একা থাকার সুযোগ নেয় পাশের ঝুপড়ির সিরাজের বাবা।

'ওই সময় পাশের ঝুপড়ির সিরাজের বাপ ঘরে ঢোকে। ঝাপটে ধরে ফারহানাকে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৯-২০)

আবার 'চিঠি' গল্পে দেখা যায় এক নামহীন কিশোরীর আত্মহত্যার কারণ। পড়াশোনায় মেধাবী ছাত্রী জন্মের সময় থেকেই তার বাবা তাকে আপন করে নিতে পারেনি। কারণ তার পিতা ছেলে সন্তান চেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে মেয়ের মধ্যে দিয়েই পিতার গভীর স্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। মেধাবী পরিচয় পাওয়ার পর কন্যাকে ঘিরে পিতার নানা স্বপ্ন। সেই মতো নামহীন কন্যা স্কুলে পড়তে

যায়। কিন্তু স্কুলের হান্নান স্যারের কামুক দৃষ্টি পড়ে তার ওপর। তাকে আলাদা করে যত্ন নিয়ে পড়ানোর নামে স্কুলে ডেকে তাকে ধর্ষণ করে হান্নান স্যার। গল্পে এর ইঙ্গিত রয়েছে এইভাবে-

'মিনিট পনেরো পরে আমি মুক্তি পেলাম হান্নান স্যারের হাত থেকে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৩৫)

'কসবি' উপন্যাসে বর্ণিত সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিটি তিনশো বছরের পুরনো। পূর্বে পাড়াটি সদরঘাট জেলেপল্লি নামে পরিচিত ছিল। উপনিবেশিক ভারতে কাজকর্মে এই অঞ্চলের বন্দরে ব্রিটিশ সাহেবসুবোদের যাতায়াত ছিল। জানা যায়, জাহাজের নাবিক, ক্যাপ্টেন জলে ভাসতে ভাসতে দীর্ঘদিন নারীসঙ্গ বিবর্জিত। তাই ভূমিতে পা রাখার জন্য তারা লোভী হয়ে ওঠে। এরকমই একজন ক্যাপ্টেন ছিলেন ম্যাগরিজ মার্টিনেজ। কর্ণফুলীর পোর্ট এরিয়ায় নেমেই সে জেলেপাড়ায় হাঁটতে বেরিয়ে ছিল। হাঁটতে হাঁটতে একটা সময় রাইচরণের বউয়ের প্রতি নজর পড়লে রাইচরণের অনুপস্থিতিতে তার বউকে ধর্ষণ করেছে। গোটা পাড়ায় ধর্ষণের কথা ছড়িয়ে গেলে রাইচরণ সকলের কাছে প্রতিকার চাইল। অসহায় দরিদ্র অশিক্ষিত জেলেদের কাছে কোনো প্রতিকার নেই। কিন্তু সমাজের সর্দার মুখ্যরা বিচারসভা বসিয়ে রাইচরণের বউ জটিলাকে 'অসতী' ঘোষণা করে তাদের একঘরে করে দিল। প্রতিশোধ নেওয়ার বদলে যে সমাজ উল্টে তাদের শাস্তি দিল, সে সমাজকে অমান্য করাই শ্রেয়। তাই জটিলা জেদ, দুঃখ, ঘৃণা ও অভাবের বসে বেশ্যাবৃত্তিকে বেছে নিল। অর্থাৎ ঔপনেবেশিক ভারতবর্ষে একজন ধর্ষিতা নারীকে সাহায্য করার বদলে তাকে অসতী প্রমাণ করে জেলেরা তাকে শাস্তি দিয়েছে। তৎকালীন সমাজবোধে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, নারীকে তার স্বামী বাদে অন্য কোনো পুরুষ যৌন স্পর্শ করলে সে তার সতীত্ব হারাবে। প্রাবন্ধিক সমালোচক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ঔপনিবেশিক ভারতের প্রেক্ষিতে তাই 'সতী' শব্দটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে-

'... Constructed Counter Narrative of women's Consciousness, thus women's being good, thus the good women's desire, thus women's desire. This slipage can be seen in the fracture inscribed in the very word sati, the feminine form of sat. Sat trans cends any gender- specific notion of masculinity and moves up not only into human but spiritual universality. It is the present participle of the verb 'to be' and as such means not only being but the true, the good, the right.'

(Ashcroft (ed.) 1995, P.100)

অর্থাৎ সৎ এর স্ত্রীলিঙ্গ হল সতী। সৎ শব্দটি যে কোনো লিঙ্গ ভেদে ব্যবহৃত হয় যা মানুষের ভালো, সঠিক, ন্যায়সম্মত, সত্য ও উচিত সত্তাকে নির্দেশ করে। কিন্তু এই 'সৎ' শব্দটির লিঙ্গ পরিবর্তনে একেবারেই ভিন্ন ধরনের অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ একজন নারীর সতীত্বকে প্রমাণ করার জন্য তার দায়দায়িত্ব, স্বামী-ভক্তি, সন্তান-সংসার প্রীতির মধ্য দিয়ে নারীর চেতনাকে শুদ্ধ, উন্নত ও একনিষ্ঠ করে তোলা অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে। একই শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তনে অর্থের এরূপ পার্থক্য নারীকে নিম্নবর্গে পরিণত করার কৌশল মাত্র। একজন পুরুষের বিপরীতে নারীকে এভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যুগ-যুগান্তর থেকে।

অন্যদিকে 'মোহনা' উপন্যাসে একাদশ শতাব্দীর কালখণ্ডে ঘটে যাওয়া কৈবর্ত বিদ্রোহের ঘটনার প্রেক্ষিতে কৈবর্ত সমাজকে প্রতিফলিত করা হয়েছে। যেখানে ডমরনগরের বারাঙ্গনাপল্লির বর্ণনায় জানা যায়-

> '... বারাঙ্গনাপল্লিতে নারীর সম্মতির প্রয়োজন নেই, নারীদের শারীরিক সুস্থতাও উপেক্ষিত হয় পুরুষদের কাছে। মিলনের আগে পুরুষেরা নারীশরীর বিমর্দনে মগ্ন থাকে। সেই বিমর্দন নারীটিকে সুখ দিচ্ছে, না ব্যথা দিচ্ছে—সেদিকে লক্ষ করার প্রয়োজন অনুভব করে না অধিকাংশ অতিথি।' (জলদাস ২০১৩, পৃ. ২০)

যেখানে অর্থের বিনিময়ে দেহভোগই উদ্দেশ্য সেখানে নারীর শারীরিক অসুস্থতাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাইতো অর্থসর্বস্ব ক্রিয়ায় সুখসর্বস্ব ফলভোগে কোনো মানবিকতার প্রশ্ন ওঠে না।

'রামগোলাম' উপন্যাসে বর্ণিত মেথরসমাজে নারী ধর্ষণের ঘটনার উল্লেখ না থাকলেও নারী ধর্ষণের চেষ্টার উল্লেখ রয়েছে। দেখা যায় ঝাউতলা মেথরপল্লিতে রূপলালের মেয়ে রূপালীকে ধর্ষণের চেষ্টা করেছে মনুলালের শ্যালক জনি। জানা যায়, ব্যান্ডেলে বার্ষিক মহোৎসবের প্রস্তুতিমূলক সভা আয়োজনের কারণে ঝাউতলা মেথর পট্টি প্রায় পুরুষশূন্য। রূপলালও সেই সভায় উপস্থিত। ফলে পিতা ও পাড়ার পুরুষদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে জনি রূপালিকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু রূপালি বটি দিয়ে জনিকে আঘাত করলে তার সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।

তাহলে দেখা গেল যে ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী নারীকে দেবী ও মায়ের সমতুল্য বলে ভাবা হয়, সেখানে একজন পুরুষের বিপরীতে নারী কেবল অধিকৃত বস্তু। শুধুমাত্র সেই পুরুষের মা, বোন, স্ত্রী কন্যা সম্পর্কের বাইরে নারীজাতি কেবলই 'Sex object'। তাইতো ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষীয় সমাজের প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা নারীদের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের নারীদের তুলনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান-

> 'Here is one more Instance of the displacement in Nationalist Ideology of the construct of women as a sex object In western Patriarchy: The the nationalist Male thinks of his own wife/sister/daughter as 'normal' precisely because she is not a "sex object", while those who could be "sex object" are not "normal". (Guha (ed.) 1997(b), p. 258)

৪.১.৪.২ নারীর অপহরণ ও পণ্যায়ন

সমাজ গঠনের কাল থেকে নারীরা পুরুষের কাছে কামবাসনার বস্তু। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-পুঁথি-পুরাণ অনুযায়ী নারীর অবস্থানের কোনো পরিবর্তন নেই। যৌনবাসনা চরিতার্থ করার জন্য নারীরা বহুকাল থেকেই পুরুষদের দ্বারা অপহৃত হয়ে আসছে। ধর্ষিত হচ্ছে যেখানে সেখানে। যৌনবস্তু রূপে নারীকে রীতিমতো পণ্য স্বরূপ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা হচ্ছে। দেশ-বিদেশে নারী পাচার একুশ শতকেও এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কলঙ্ক ও ব্যাধিরূপে বিরাজিত। যার কোনো নিরাময় নেই। আমরা জানি সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে ক্ষমতার এককে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের দ্বিমুখী বৈপরীত্য প্রক্রিয়ায় আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্ককে নানা দিক থেকে 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' চর্চা ও বিশ্লেষণ করেছে। দেশকাল সমাজ নির্বিশেষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবমূল্যায়ন নারীকে বিশেষভাবে পুরুষের বিপরীতে নিম্নবর্গ রূপে নির্মাণ করেছে। হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজেও নারীর অবমূল্যায়নের এই দিকটি উপেক্ষিত হয়নি।

প্রবহমানকাল ধরে নারীকে 'Sex object' হিসেবে প্রতিপন্ন করার ফলে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে ও প্রান্তে পতিতাপল্লি গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিককালের সমাজ ও সামাজিক আইন নারীদের দেহব্যবসাকে আইনসম্মত বলে মত প্রদানও করেছেন। তবে এও সত্য যে, কোনো নারী স্বেচ্ছায় তার দেহকে বারংবার বহু পুরুষ দ্বারা অবগাহিত করতে চায় না, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অসহায় অবস্থায় সে বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। হরিশংকর জলদাস সমাজের এই দিকটির প্রতি সচেতন দৃষ্টি দিয়ে 'কসবি' উপন্যাসটি সৃজন করেছেন। বাংলাদেশের চট্টগ্রামের প্রাচীন বেশ্যাপল্লি সাহেবপাড়া আলোচ্য উপন্যাসের পটভূমি। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় পতিতা চরিত্র দেবযানীর অতীত জীবনে লক্ষ করা যায় যে, সে একজন জেলে পরিবারের কন্যা। বীরপুরের দাসপাড়ায় তার বাড়ি, আসল নাম কৃষ্ণা। পিতার নাম শৈলেশ দাস। মা যশোদা মারা যাবার পর থেকে পিতা শৈলেশ মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সংসারে অভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে কৃষ্ণা বাধ্য হয়ে পূর্ব পরিচিত ফল বিক্রেতা তপনের সাহায্য কামনা করে। কিন্তু তপন সাহায্য করার বদলে কৃষ্ণার দেহভোগ করেছে। ঘটনাক্রমে,

> 'অর্থনৈতিক দুরবস্থা, পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতা, যৌন মিলনের প্রবল আসক্তি, বিয়ের প্রলোভনের ঘূর্ণিতে পড়ে একরাতে কৃষ্ণা তপনের সঙ্গে পালাল।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৫৩)

চট্টগ্রামের সোনালি বোর্ডিং হোটেলে মুসলমান দম্পতি পরিচয়ে তপন কৃষ্ণাকে নিয়ে গিয়ে দিন-রাত তাকে ভোগ করতে থাকে। এভাবে কিছু দিন চলার পর-

'...এক রাতে 'একটু নিচ থেকে আসি' বলে তপন বেরিয়ে গেল, আর ফিরল না।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৫৪)

পরদিন সকালে কৃষ্ণাকে একা দেখে হোটেলের মালিক বদর মিঞার বুঝতে অসুবিধা হল না পুরুষ সঙ্গীটির প্রতারণা। ফলে সে দেরি না করে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লির দালাল শামছুকে খবর দেয়। বদর মিঞাকে উচিত মূল্য দিয়ে শামছু কৃষ্ণাকে উদ্ধার করার নামে কিনে নেয় এবং দু-দিন পর কৃষ্ণাকে বাড়ি পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে-

'শামছু কৃষ্ণাকে নিয়ে গিয়ে কালু সর্দারের কাছে চড়া দামে বেচে দিল।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৫৫)

পরদিন সকালে কৃষ্ণা জানতে পারে শামছু তাকে বেশ্যাপল্লিতে বিক্রি করে দিয়ে গিয়েছে। শৈলবালার পা জড়িয়ে কৃষ্ণা নিজ চরিত্র নষ্ট না করার অনুরোধ করলে, শৈলবালা বলে-

'চরিত্র? কীসের চরিত্র? বেশ্যাপাড়ার মাগির আবার চরিত্র কী? তুমি তো মাইয়া ফুলের মতো পবিত্র না। হোটেলে পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটাইছ। ... এই মাগিপাড়ায় এসে চরিত্র বাঁচাইতে চাও? (জলদাস ২০১১, পৃ. ৫৭)

নিরুপায়, অসহায়, ভীত কৃষ্ণা পরিস্থিতির জালে এইভাবে দেবযানী পতিতায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। তবে শুধু কৃষ্ণা নয়, কৃষ্ণাকে বশে আনার জন্য শৈলমাসি যে পতিতার শরণাপন্ন হয়েছিল—চম্পা, সেও এক সাধারণ পরিবারের আদরের মেয়ে ছিল। উপন্যাসে জানা যায়, বছর দশেক আগে চম্পা শৈলবালার হাতে এসেছিল। সৈয়দপুরে বাড়ি তার। যুবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নুর আলি নামে এক ব্যক্তির নজরে পড়েছিল চম্পা। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। তারপর শরীর ভোগ করা হয়ে গেলে নুর আলি চম্পাকে শৈলমাসির কাছে বিক্রি করে দেয়। এরকম আরো একজন পতিতা হল ইলোরা। তার আসল নাম উমা প্রু চাকমা। রাঙামাটির প্রত্যন্ত এলাকায় এক বাঙালিবাবুর প্রেমে পড়ে ঘর থেকে পালিয়েছিল সে।

'মধু সংগ্রহের পর সেই প্রেমিক তাকে এই পাড়ায় বিকিয়ে দিয়ে গেছে। প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা, মা-বাবা ত্যাগের অপরাধবোধ, মাসি আর কাস্টমারের দৈহিক নির্যাতন তাকে প্রায় বোবা করে তুলেছিল।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৭৫)

অন্যদিকে 'মোহনা' উপন্যাসে নারী অপহরণ করে পতিতাপল্লিতে বিক্রি করার ঘটনার উল্লেখ পাই। উপন্যাস অনুযায়ী মোহনা গাঙ্গী নামক জেলেপল্লিতে জন্মেছে। ছোটোবেলায় অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলারত অবস্থায় নারী চোরাচালানকারী সনকা তাকে চুরি করে ডমরনগর বারাঙ্গনাপল্লিতে নিয়ে আসে। তারপর জানকি মাসি মোহনাকে সনকার কাছ থেকে কিনে নেয়। উপন্যাসে জানা যায়-

'সনকার কাছ থেকে জানকি মোহনাকে কিনে নিয়েছিল। সে সময় সনকাদের মতো যৌবনহারা বারাঙ্গনারা গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষুক সেজে বা বেদের মেয়ে সেজে ঘুরে বেড়াত। সুযোগ পেলে মোহনাদের মতো বালিকাদের চুরি করে নিয়ে

আসত। তারপর বিক্রি করে দিত বারাঙ্গনাপল্লিগুলোতে। শুধু ডমরনগর নয়, বৈশালি, মগধ, চম্পকনগর, গৌড় প্রভৃতি নগরের অধিকাংশ বারাঙ্গনা এভাবেই সংগৃহীত হত।' (জলদাস ২০১৩, পৃ. ২৭)

আবার 'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাসে মৎস্যসমাজের রূপকে মানবসমাজকে পরিস্ফুট করার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে মৎস্য সমাজের নানা সামাজিক শোষণ অত্যাচার ও পীড়নের কথা। উপন্যাসে জানা যায়,

'এই জলের তলায় কতো কিছু ঘটে যায়! বিশ্বাসঘাতকতা, অপমান, লাঞ্ছনা, তিরস্কার, প্রবঞ্চনা, সম্পত্তি লুণ্ঠন, নারী অপহরণ—কত কিছুই না সংগঠিত হয়!' (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ৪২)

তাইতো মানবসমাজের মতোই মৎস্যসমাজেও দেখা গিয়েছে নারী লুণ্ঠন, নারী ধর্ষণের মতো ঘটনা। যেমন, জলধি গ্রামের সর্দার পঞ্চুর ছেলে জগাই বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও রূপসী নামক এক মৎস্যনারীকে অপহরণ করে বিয়ে করার হুমকি দেয়।

'... যদি রাজি না হও, তাইলে তোরে তুইলে লইয়া যাইব রূপসী।' (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ৫৬)

শুধু তাই নয়, পঞ্চু নিজেও ঘরে স্ত্রী থাকতে বিজাতীয় সুন্দরী মৎস্যকন্যা রুমকিকে জোর-জবরদস্তি বিয়ে করে ঘরে আনে। উপন্যাস দেখা যায়-

'দ্বিতীয় বউ রুমকি স্বেচ্ছায় বউ হয়ে আসেনি পঞ্চুর ঘরে। পঞ্চু সর্দার জোর-জবরদস্তি করে রুমকিকে ঘরে তুলেছিল। যমুনা ভীষণ নারাজ ছিল এই বিয়েতে। কিন্তু পঞ্চুর অত্যাচার আর নিজের অসহায় ভবিষ্যৎ জীবনের কথা চিন্তা করে চুপ করে থেকেছে যমুনা।' (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ৫৯)

নারীর প্রতি শোষণ ও অন্যায় হওয়া সত্ত্বেও বিপরীত লিঙ্গের ক্ষমতা, অত্যাচার ও নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নীরব থাকা প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মন্তব্য। 'Can the subaltern speak?' প্রবন্ধে নিম্নবর্গীয় নারী চেতনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন-

'The cautions I have just expressed are valid only if we are spiking of the subaltern women's consciousness- or, more acceptably, subject. Reporting on, or better still, participating in, antisexist work among women of color or women in class opression in the First World or the Third World is undeniably on the agenda. … Yet the assumption and construction of a consciousness or subject sustains such work and will, in the long run, cohere with the work of imperialist subject-constitution, minyling epistemic violence with the advancement of learning and civilization. And the subaltern women will be as mute as ever.' (Ashcroft (ed.) 1995, p. 90)

অর্থাৎ একথা পরিষ্কার যে, কেউ যদি দরিদ্র, অসহায় ও বিশেষ করে নারী হয় তাহলে বিষয়টি নারীচেতনার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথম বিশ্ব বা তৃতীয় বিশ্বের নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। আমাদের উচিত এই সব নীরব এলাকায় তথ্য পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করা। যা পরবর্তীকালে দীর্ঘমেয়াদে সাম্রাজ্যবাদী সাংবিধানিক কাজের

সঙ্গে সমন্বয় করবে। কিন্তু তবুও শিক্ষা ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে নারী চেতনার কোনো পরিবর্তন হবে না। কারণ নিম্নবর্গীয় নারী আগের মতোই নিঃশব্দে থাকবে। আমরা জানি সমাজ-ইতিহাসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে সাহিত্যও তথ্য সংগ্রহের কাজটি করে থাকে। তাইতো ইতিহাসের মতো সাহিত্যেও নিম্নবর্গীয় নারীর নিরাপত্তাহীনতা আমরা আলোচ্য গল্প-উপন্যাসগুলিতে লক্ষ করলাম।

যেমন 'সুখলতার ঘর নেই' উপন্যাসে পঞ্চুর বাড়িতে কর্মরতা অসহায় দাসী। জগাই-পঞ্চুর মতো চরিত্রহীনদের সঙ্গে একই ছাদের তলায় থাকতে থাকতেই সে বহুবার বহুভাবে লাঞ্ছিত হতে হতে নারীত্বের সকল সম্ভ্রমবোধের কথা ভুলে গিয়েছে। অবলীলায় তাই সে উচ্চারণ করে-

'দেহের ক্ষুধা মিটাইতে হয় আমারে। রাইতের বেলা জগাই আসে ঘরে। দলাই-মলাই করে। শইলে শইলে ডলে।'

(জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ১২০)

অর্থাৎ অসহায় নিরুপায় দাসীটি জগাইয়ের কাছে 'sex object' ছাড়া কিছুই নয়। ঘরে স্ত্রী থাকতে সে তার যৌন পিপাসা চরিতার্থ করার জন্য দাসীটিকে শুধুমাত্র পণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছে। যৌন শোষণ করেছে। কিন্তু দাসী তার প্রতিবাদ করতে পারেনি। সে নীরব থেকেছে। আবার অন্যদিকে সুখলতার রতিকান্তের সঙ্গে বিয়ের পর তারা একসঙ্গে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের হলে পথে জগাই ও জিগলু তাদের পথ অবরোধ করে এবং জোরপূর্বক সুখলতাকে অপহরণ করে।

'সেই পূর্ণিমার রাতে সুখলতাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল জগাই।' (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ১৩৬)

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক মন্তব্য করেছিলেন,

'If in the context of colonial production, the subaltern has no history and cannot speak, the subaltern as female in even more deeply in shadow.' (Ashcroft (ed.) 1995, p. 82-83)

নারীরা যে আরো গভীর অন্ধকারের ছায়ায় নিমজ্জিত এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করার লক্ষ্যেই প্রাবন্ধিক নারীকে আলাদা করে নিম্নবর্গের ইতিহাস-চর্চায় গুরুত্ব দিয়েছেন, যা কিনা উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিক আলোচনায় একটি আলাদা মাত্রা যোগ করেছে।

৪.২ সারাংশ

নারী শোষণের কেন্দ্রে রয়েছে পুরুষ শাসিত সমাজ। পুরুষের বিপরীতে নারীকে অধস্তনরূপে নির্মাণ করা হয়েছে পুরুষজাতির স্বার্থ অনুসারে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী সর্বদাই অন্ধকারের ছায়াতলে। তাইতো পুরুষ মুখ্য, নারী গৌণ; পুরুষ শরীর, নারী ছায়া; পুরুষ প্রভু, নারী দাসী; পুরুষ বংশের আলো, নারী গলগ্রহ; পুরুষ বিশেষভাবে বাহন করার কারক, নারী দান করার পাত্রী। যদিও পৃথিবীতে শুধু নারীরাই

শোষিত ও বঞ্চিত নয়, অধিকাংশ শ্রেণির পুরুষেরাও শৃঙ্খলিত ও শোষিত। কিন্তু সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বশ্রেণির নারীরাই শোষিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই নারীদের সামাজিক এই দুরবস্থাকে উপলব্ধি করে প্রাবন্ধিক হুমায়ূন আজাদ মন্তব্য করেন-

> 'নারীশোষণে বুর্জোয়া ও সর্বহারায় কোনো পার্থক্য নেই; বুর্জোয়া পুরুষ শুধু সর্বহারা শ্রেণিটিকে শোষণ করে না, শোষণ করে তার নিজের শ্রেণির নারীকেও; আর সর্বহারা পুরুষ নিজে শোষিত হয়েও অন্যকে শোষণ করতে দ্বিধা করে না, সে শোষণ করে নিজের শ্রেণির নারীকে। বিত্তবান শ্রেণির নারী পরগাছার পরগাছা, বিত্তহীন শ্রেণির নারী দাসের দাসী। শোষণে সব শ্রেণির পুরুষ অভিন্ন;... নারীর প্রভু ও শোষক সব পুরুষ; অন্ধও নারীর শোষক; উন্মাদও নারীর প্রভু।... কোনো বিশেষ সামাজিক শ্রেণি নারীর শোষক নয় ব'লে, পুরুষতন্ত্রই যেহেতু নারীর শোষক, তাই সামাজিক বিপ্লবের ফলে পুরুষ মুক্তি পেলেও নারী মুক্তি পায় না, নারীকে মুক্তি দেয়া হয় না।... তাই নারীই এখন বিশুদ্ধ শোষিত ও সর্বহারা।' (আজাদ ১৯৯২, পৃ. ১৪-১৫)

নিম্নবর্গীয় চেতনায় শোষণ ও বঞ্চনার বিভিন্ন প্রকৃতিগুলি আসলে সামাজিক কাঠামোয় ক্ষমতার অসম বণ্টনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে সেখানে নিম্নবর্গ প্রায় ক্ষেত্রেই প্রতিবাদহীন। যদিও কিছু ক্ষেত্রে তারা তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে উচ্চবর্গের রোষের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। যার ফলে উচ্চবর্গের শোষণ আরো তীব্রতর রূপে প্রকাশ পেয়েছে নিম্নবর্গের প্রতি। অর্থাৎ একদিকে নিম্নবর্গের প্রতিবাদহীনতা, অন্যদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—এই দুইয়ের মাঝে পড়ে তারা বারবার কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। তবে হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্বে বর্ণিত নিম্নবর্গ সাময়িকভাবে মার খেয়ে মার সহ্য করলেও একটা সময় তাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার উদ্ভব হয়েছে, যা পরবর্তীকালে তাদের সম্যক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম করেছে। নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনার এই দিকটিকে আমরা পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।